উদ্যান ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

সম্পাদনা

শাহনাজ বেগম নীনা

প্রকল্প পরিচালক

আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায়

সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

www.dam.gov.bd

উদ্যান ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ
ও
বিপণন কৌশল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রকাশনায়	:	সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায়, (বিপণন অংগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা-১২১৫
প্রকাশকাল	:	প্রথম সংস্করণ- মে ২০১৩ মুদ্রণ সংখ্যাঃ ১,০০০ কপি।
সার্বিক সহযোগীতায়	:	পোষ্ট হারভেষ্ট এক্সটেনশন অফিসারবৃন্দ।
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা	:	শাহনাজ বেগম নীনা প্রকল্প পরিচালক আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)
কম্পিউটার কম্পোজ ও অলংকরণ	:	সুকান্ত চাকমা, কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী, আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)
	:	সবুজ ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর কাম অফিস সহকারী, আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)
কম্পিউটারে বিশেষ সহযোগীতা	:	আমজাদ হোসেন সরকার, হিসাব রক্ষক, আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)
মুদ্রন সহযোগীতা	:	মোঃ গিয়াস উদ্দীন ০১৯১১২১৭৯৩১, ০১৬১১২১৭৯৩১

মুখবন্ধ

মানুষের দেহে শক্তি সরবরাহ, দৈহিক গঠন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য খাদ্য গ্রহণ অপরিহার্য। এ তিনটি কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার নামই পুষ্টি। আমাদের দেশে অপুষ্টিজনিত সমস্যা একটি মারাত্মক সমস্যা। এ সমস্যা শুধু যে, মানুষের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, অসুস্থতা, কর্মক্ষমতা ও আয়ুকে প্রভাবিত করে তাই নয়, কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন তথা দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নয়নেও এর প্রভাব পড়ে। দেশের জনসাধারণের অপুষ্টি দূরীকরণে শাক-সবজি ও ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম। শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ পুষ্টি উপাদান আমরা শাক-সবজি ও ফলমূল থেকে পেয়ে থাকি। আর্থিক অস্বচ্ছলতার পাশাপাশি শাক-সবজি ও ফলমূল সহজলভ্য না হওয়ায় পরিমানমত খাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। অথচ দেশে উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৩০-৫০ ভাগ যা আর্থিক ও পুষ্টি বিবেচনায় অত্যন্ত ব্যাপক। তাছাড়া ফল ও সবজির মাত্র শতকরা ১ ভাগ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাত করা হয়ে থাকে। পুষ্টি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে এবং শাক-সবজি ও ফলমূলের অপচয় রোধকল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণের বিকল্প নেই। শাক-সবজি ও ফলমূলের অপচয়রোধকল্পে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তি সম্পর্কে গ্রামীণ জনগোষ্ঠির তেমন কোন ধারনা নেই। গ্রাম এলাকার লোকজন বিশেষ করে মহিলাদের শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে উৎপাদিত ফসলের অপচয় অনেকাংশে কমে যাবে এবং পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত হবে। অন্যদিকে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যদ্রব্য যেমন-আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলী, চিপস ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসহ দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে।

জনসাধারণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও শাক-সবজি ফলমূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসকল্পে গৃহ পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করাসহ কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে একটি টেকসই বিপণন যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের "সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)" শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক প্রণীত উদ্যান ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে করি। এ ম্যানুয়ালে সন্নিবেশিত সকল বিষয় অত্যন্ত সহজ ও সাবলিল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, যা অত্যন্ত সহজে প্রশিক্ষণার্থীগণের বোধগম্য হবে। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের যথাযথ ব্যবহারে দেশের উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফলমূলের অপচয় রোধ তথা জনগণের পুষ্টি উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা যারা মূল্যবান অবদান রেখেছেন তাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী)
পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়

জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বাং
মে, ২০১৩ ইং

প্রসঙ্গ কথা

অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূরীকরণে শাক-সবজি ও ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমূহের অধিকাংশই আমরা শাক-সবজি ও ফলমূল থেকে পেয়ে থাকি। আমরা প্রতিদিন গড়ে যে পরিমাণ শাক-সবজি ও ফলমূল খেয়ে থাকি তা আমাদের শরীরের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। আমাদের দেশে শাক-সবজি ও ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও সচেতনতার অভাবে আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাই না। কৃষক পর্যায় থেকে শুরু করে বিপণনের বিভিন্ন পর্যায়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ জ্ঞানের অভাবে শাক-সবজি ও ফলমূলের একটি বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যায় যা শতকরা ৩০-৫০ ভাগ প্রায়। তাছাড়া বিভিন্ন কারণে উৎপাদিত পণ্যের গুনগতমান নষ্ট হয়। তাই শাক-সবজি ও ফলমূলের সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ একান্ত জরুরী। দেশের সকল জনসাধারণকে এ ব্যাপারে সচেতন করার পাশাপাশি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে এ অপচয় রোধ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরা সম্ভব হবে। অপরদিকে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য যেমন- আচার, চাটনী, জ্যাম, জেলী, চিপস ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ অর্থ উপার্জন ও পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারবে। এ উদ্দেশ্যে সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (ডিএএম অংগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কৃষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গ্রুপ গঠন করে প্রশিক্ষণ প্রদান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "উদ্যান ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কৌশল" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি গ্রাম এলাকার মহিলাসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজে অত্যন্ত সহায়ক এবং কার্যকরী হবে বলে মনে করি। এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট-সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ এ ম্যানুয়ালটি প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহার করতে পারবে। দেশের উৎপাদিত শাক-সবজি ও ফলমূলের অপচয় রোধ তথা পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও দারিদ্রতা বিমোচনেও এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আমার একান্ত বিশ্বাস। ম্যানুয়ালটি প্রকাশে তথ্য, উপাত্ত, পরামর্শ দিয়ে যে সব বিভাগ ও সংস্থা আমাদের সহযোগিতা করেছে তাদের ধন্যবাদ ও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০ বাং
মে, ২০১৩ ইং

(শাহনাজ বেগম নীনা)
প্রকল্প পরিচালক
সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (ডিএএম অংগ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

সূচীপত্র

প্রথম ভাগের প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.১	উদ্যান ফসলের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব	১১
১.১.১	খাদ্য হিসেবে শাক-সবজি ও মসলার গুরুত্ব	১২
১.১.২	শাক-সবজি, ফলমূল ও মসলা জাতীয় খাদ্যের খাদ্যমান	১৩
১.১.৩	বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন এর কার্যাবলী ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা	১৩
১.১.৪	বিভিন্ন খনিজ লবণ এর উৎস ও প্রতিরোধ ক্ষমতা	১৯
১.১.৫	দেশীয় ফলের গুরুত্ব	১৯
১.১.৬	দেশীয় ফল ও শাক-সবজির অপ্রচলিত কতিপয় উপকারিতা	২০
১.১.৭	দেশীয় ফল ও শাক-সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব	২৪
১.২	উদ্যান জাতীয় ফসল সংগ্রহের সময়, পরিপক্কতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	২৫
১.২.১	উদ্যান জাতীয় ফল সমূহ	২৫
১.২.২	লেবু জাতীয় ফল	২৮
১.২.৩	অন্যান্য ফল সমূহ	৩০
১.২.৪	কপি জাতীয় সবজি	৩৪
১.২.৫	মূল জাতীয় সবজি	৩৬
১.২.৬	ফল জাতীয় সবজি	৩৮
১.২.৭	কুমড়া জাতীয় সবজি	৩৯
১.২.৮	সীম জাতীয় সবজি	৪৪
১.২.৯	কন্দাল জাতীয় সবজি	৪৫
১.২.১০	শাক জাতীয় সবজি	৪৭
১.২.১১	মসলা জাতীয় ফসল	৫০
১.২.১২	কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর কুফল	৫৪
১.৩	ফল ও সবজি টাট্‌কা অবস্থায় বাজারজাত করার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম	৫৬
১.৩.১	ফসল তোলার বা সংগ্রহ করার পদ্ধতি	৫৬
১.৩.২	ফসল তোলার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি	৫৮
১.৩.৩	ফসল তোলার পাত্র	৫৯
১.৩.৪	গাছ থেকে ফল পাড়ার সতর্কতা	৬০
১.৩.৫	ফসল মাঠ থেকে পরিবহণ	৬১
১.৩.৬	ফসলের কিওরিং	৬১
১.৩.৭	ফসল পরিষ্কারকরণ (ক্লিনিং)	৬৪
১.৩.৮	ফসল সর্টিং পদ্ধতি	৬৫
১.৩.৯	ফসল গ্রেডিং করার পদ্ধতি	৬৫
১.৩.১০	প্রমিতকরণ পদ্ধতি	৬৬
১.৩.১১	ফসল বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি	৬৭
১.৪	ফল ও সবজি প্যাকিং ও পরিবহণ	৭০
১.৪.১	প্যাকেজিং কি?	৭০
১.৪.২	প্যাকেজ বা প্যাকেট তৈরীর উপাদানের শ্রেণীবিভাগ	৭১
১.৪.৩	প্যাকেজিং নির্বাচন	৭১
১.৪.৪	কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে প্যাকেজ এর ধরণ	৭১
১.৪.৫	প্যাকেজিং এর প্রয়োজনীয়তা	৭২
১.৪.৬	ফল ও সবজির প্যাকিং	৭২
১.৪.৭	প্যাকেটের আকার আকৃতি	৭৭

১.৪.৮ প্যাকেজিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ---------- ৭৮
১.৪.৯ প্যকেজিংয়ের আয়-ব্যায়ের হিসাব ---------- ৭৮
১.৪.১০ প্যকেজিংয়ের পাত্রসমূহ ---------- ৭৯
১.৪.১১ প্যাকেজিং লাইন ---------- ৮১
১.৪.১২ ফল ও সবজি পরিবহন ---------- ৮২
১.৪.১৩ ফল ও সবজি পরিবহনের উপায় এবং যন্ত্রপাতি ---------- ৮৩
১.৪.১৪ বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহনের মাধ্যমসমূহ ---------- ৮৪
১.৪.১৫ পরিবহণ পথে পণ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা ---------- ৮৪
১.৪.১৬ বিমানে পরিবহন ---------- ৮৫
১.৪.১৭ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ---------- ৮৬
১.৪.১৮ টাট্‌কা পণ্যের কোল্ড চেইন মার্কেটিং ---------- ৮৬

১.৫ বিভিন্ন ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল এবং এর গুরুত্ব ---------- ৮৭
১.৫.১ প্রক্রিয়াজাতকরণ ---------- ৮৭
১.৫.২ প্রক্রিয়াজাতকরণ এর গুরুত্ব ---------- ৮৭
১.৫.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণ এর পদ্ধতিসমূহ ---------- ৮৯
১.৫.৪ আচার, চাটনী ও সস তৈরী করে সংরক্ষণ ---------- ৯০
১.৫.৫ জুস বা স্কোয়াশ তৈরী করে ফলের রস সংরক্ষণ ---------- ৯১
১.৫.৬ স্টীপিং পদ্ধতি বা লবনের দ্রবনে সবুজ ফল সংরক্ষণ ---------- ৯১
১.৫.৭ ফল ও সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ ---------- ৯২
১.৫.৮ শক্তি ব্যবহারবিহীন বাস্পীভবন জাত শীতক ---------- ৯২

১.৬ সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ও দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ---------- ৯৪
১.৬.১ সাপ্লাই চেইন ---------- ৯৪
১.৬.২ ভ্যালু চেইন ---------- ৯৬
১.৬.৩ ভ্যালু চেইন উন্নয়নে কৃষি কর্মকর্তার করণীয় ---------- ১০০
১.৬.৪ ভ্যালু চেইন উন্নয়নে বাধাসমূহ ---------- ১০০
১.৬.৫ ভ্যালু চেইন উন্নয়নের কৌশল ---------- ১০০
১.৬.৬ কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনায় কৃষক দলের ভূমিকা ---------- ১০১
১.৬.৭ কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনার কিছু মডেল ---------- ১০৩

দ্বিতীয় ভাগের প্রশিক্ষণ

২.১	**ফল ও সবজি'র বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি ও গুরুত্ব**	**১০৯**
২.১.১	চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ	১১০
২.১.২	আচার, চাটনী এবং সস তৈরী করে সংরক্ষণ	১১১
২.১.৩	জুস বা স্কোয়াশ তৈরী করে ফলের রস সংরক্ষণ	১১২
২.১.৪	স্টীপিং পদ্ধতি বা লবনের দ্রবনে সবুজ ফল সংরক্ষণ	১১২
২.১.৫	শক্তি ব্যবহারবিহীন বাস্পীভবনজাত শীতক	১১৯
২.২	**চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ**	**১২৪**
২.২.১	পেয়ারার জেলী	১২৪
২.২.২	কাঁঠালের জ্যাম	১২৫
২.২.৩	আনারসের জেলী	১২৬
২.২.৪	আনারসের জ্যাম	১২৭
২.৩	**আচার, চাটনী এবং সস তৈরী করে সংরক্ষণ**	**১২৮**
২.৩.১	আমের আচার	১২৮
২.৩.২	কাঁঠালের আচার	১২৯
২.৩.৩	কাঁঠালের লেদার	১৩০
২.৩.৪	আমড়ার আচার	১৩১
২.৩.৫	জলপাই এর আচার	১৩২
২.৩.৬	চালতার আচার	১৩৩
২.৩.৭	বেগুনের টকমিষ্টি আচার	১৩৪
২.৩.৮	মিশ্র সবজির আচার	১৩৫
২.৩.৯	রসুনের আচার	১৩৬
২.৩.১০	জলপাই এর মিষ্টি চাটনী	১৩৬
২.৩.১১	বরই-তেতুঁল এর টকমিষ্টি চাটনী	১৩৮
২.৩.১২	টমেটো কেচাপ	১৩৯
২.৪	**জুস বা স্কোয়াশ তৈরি করে ফলের রস সংরক্ষণ**	**১৪১**
২.৪.১	আনারসের স্কোয়াশ	১৪১
২.৪.২	আমের নেক্টার	১৪২
২.৪.৩	আমের জুস	১৪৩
২.৫	**চিপস তৈরী করে সংরক্ষণ**	**১৪৪**
২.৫.১	কলার চিপ্স	১৪৪
২.৫.২	আলুর চিপ্স	১৪৫
২.৫.৩	আলু ফ্রেন্স ফ্রাই	১৪৬
	ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচের বোতল/রাসায়নিক দ্রব্যাদি/ প্রিজারভেটিভ ইত্যাদির প্রাপ্তিস্থান	**১৪৭**
	ফসল পঞ্জিকা	**১৪৮**

প্রথম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ সূচি- ১ম ভাগ

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষকের নাম
০৯.০০-৯.৩০	রেজিষ্ট্রেশন ও উদ্বোধন	
৯.৩০-১০.৩০	উদ্যান ফসলের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব	
১০.৩০-১০.৫০	চা বিরতি	
১০.৫০-১১.৫০	ফসল সংগ্রহ কৌশল ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা	
১১.৫০-১২.৫০	ফল ও সবজি টাটকা অবস্থায় বাজারজাত করার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম (ফসল সংগ্রহ, কিউরিং, ক্লিনিং, সর্টিং, গ্রেডিং, প্রমিতকরণ ইত্যাদি)	
১২.৫০-০১.৪০	**নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতি**	
০১.৪০-২.৪০	ফল ও সবজি প্যাকিং ও পরিবহণ	
০২.৪০-৩.৪০	বিভিন্ন ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল এবং এর গুরুত্ব	
০৩.৪০-৪.৪০	ভ্যালু চেইন, সাপ্লাই চেইন ও দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	
০৪.৪০-৫.০০	সমাপনী	

১.১ উদ্যান ফসলের পরিচিতি, পুষ্টিমান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব

⇨ **কি জানা যাবে:** উদ্যান ফসল কোনগুলো?

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন?** উদ্যান ফসলের বর্তমান বাজার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সূচনা: উদ্যান বা বাগানে উৎপাদিত ফসল যেমন-ফল, শাক-সবজি, মসলা, ফুল ও শোভা বর্ধনকারী উদ্ভিদকে (অর্কিড, ক্যাকটাস ইত্যাদি) উদ্যান ফসল বলে। উদ্যান ফসল যে কেবল বাগানেই ফলে তা নয়। বর্তমানে বিরাট পরিসরে মাঠেও উদ্যান ফসলের উৎপাদন হচ্ছে। যেমন- কলা, কুল, পেঁপে, পেয়ারা ও বিভিন্ন প্রকার সবজি, ফুল।

শাক-সবজি: উদ্যান ফসলের প্রধান বিভাগ হল শাক-সবজি। সাধারণত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের সম্পূর্ণ অংশ অথবা অংশ বিশেষ রান্না করে অথবা অর্ধসিদ্ধ ও কচি অবস্থায় খাওয়া হয়। অনেক ধরনের উদ্ভিদ শাক ও সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এদের বৈশিষ্ট্যও বিচিত্র রকমের। শাক-সবজি, গুল্ম, বিরুৎ অথবা বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদের অংশও হতে পারে। কোনটি একবর্ষজীবী, কোনটি দ্বিবর্ষজীবী আবার কোনটি বহুবর্ষজীবী গাছের অংশ বিশেষ সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কচি কাঁঠাল, পেঁপে ইত্যাদি।

ফলের পরিচয়: উদ্যান ফসলের মধ্যে ফল অন্যতম। গাছের যে অংশটি ফুলের পরাগায়ণ ও নিষেক ক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে বীজ ধারন করে ও ভবিষ্যৎ বংশ বৃদ্ধি করে তাকে ফল বলে। যেমন- আম, কাঁঠাল, কলা, জাম, লিচু ইত্যাদি।

ফুলের পরিচয়: একটি গাছের পূর্ণাঙ্গ বয়সের ধাপ ফুল যা সাধারণত ভবিষ্যৎ বংশ বিস্তার করে। ফুল সৌন্দর্য্যের প্রতীক ও মানব সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ফুলের সৌন্দর্য্য কেবল চোখ ও মনের পিপাসাই নিবারণ করে না, বরং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

শোভা বর্ধনকারী ফসল: যে সকল উদ্ভিদ তার বিচিত্র পত্রবিন্যাস ও আকৃতির জন্য বিশেষভাবে চাষ করা হয় তাদেরকে বলা হয় শোভা বর্ধনকারী ফসল। যেমন- পাতাবাহার, কৃষ্ণচূড়া, ক্যাকটাস, অর্কিড জাতীয় গাছ ইত্যাদি।

মসলা : মসলা বলতে আমরা বুঝি শুকনা বীজ, ফল, ফুল, পাতা, মূল, গাছের ছাল অথবা সবজির মত ভক্ষণযোগ্য অংশ যা খাদ্য প্রস্তুতির সময় খাদ্যের স্বাদবৃদ্ধি, সুগন্ধ, রং এবং খাদ্য সংরক্ষণ করতে ব্যবহার করা হয়। যেমন:- মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, মেথি, হলুদ, তেজপাতা, পেঁয়াজ, রসুন, এলাচি, দারুচিনি ইত্যাদি।

শাক-সবজি ও মসলার শ্রেণী বিভাগ

শ্রেণী	শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন
পাতা জাতীয়	লেটুস, পালংশাক, লাউশাক	পুঁইশাক, ডাঁটাশাক, কচুশাক, গিমাকলমী, সজিনাপাতা
সরিষা পরিবারভুক্ত	বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলী, বাটি শাক	চিনাশাক, চিনা বাঁধাকপি
সীম পরিবারভুক্ত	দেশী সীম, মটরশুটি	বরবটি, কামরাঙ্গা, সীম, অড়হর
কুমড়া পরিবারভুক্ত	লাউ, মিষ্টিকুমড়া, উচ্ছে, খিরা	মিষ্টিকুমড়া, চালকুমড়া, শসা, করলা, পটল, তরমুজ, কাঁকরোল, ঝিংগা, চিচিংগা
কন্দাল ও মূল জাতীয়	গাজর, মূলা, শালগম, ওলকপি বীট, গোল আলু	ওলকচু, মিষ্টি আলু, মুখীকচু, পানিকচু
বেগুন পরিবারভুক্ত	বেগুন, টমেটো, ক্যাপসিকাম	বেগুন
বিবিধ সবজি	-	সজিনা, ঢেঁড়শ
মসলা	পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতা, জিরা, মেথী	আদা, হলুদ, গোল মরিচ

১.১.১ খাদ্য হিসেবে শাক-সবজি, ফলমূল ও মসলার গুরুত্ব:

সু-স্বাস্থ্যের জন্য সুষম খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ সব ধরনের পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার দৈনিক খাওয়া প্রয়োজন। আর সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সবজি এবং ফল খাওয়া উচিত। বাংলাদেশের জনসাধারনের মধ্যে ব্যাপক পুষ্টি ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে পরিচালিত বিভিন্ন জরীপের ফলাফলে দেখা যায় যে, অপুষ্টি বাংলাদেশের জনসাধারনের একটি বড় সমস্যা। খাদ্যে প্রোটিন, ভিটামিন এবং কয়েকটি খনিজের অভাবই হচ্ছে এ সমস্যার মূল কারণ। প্রতিবছর বাংলাদেশে প্রায় চল্লিশ হাজার শিশু ভিটামিন-'এ' এর অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আয়রনের অভাবজনিত এনিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতা রোগে ভুগছে অসংখ্য নারী ও শিশু। শতকরা প্রায় আশি জনেরই রয়েছে ভিটামিন-'সি' এর অভাব, যার ফলে তাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে। মানুষের খাবারে পুষ্টির উৎস হিসাবে সবজি ও মসলার ব্যবহার অনস্বীকার্য। অধিক সবজি উৎপাদন ও গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনসাধারনের পুষ্টির অভাবজিনত সমস্যা এবং সাথে সাথে খাদ্য সমস্যাও বহুলাংশে কমিয়ে আনা যেতে পারে।

খাদ্য হিসেবে মানবদেহে শাক-সবজি ও ফলের প্রধান কার্যাবলী

১.১.২ শাক-সবজি, ফলমূল ও মসলা জাতীয় খাদ্যের খাদ্যমান:

ক্যালরী সমৃদ্ধ শাক-সবজি ও ফলমূলের মধ্যে রয়েছে গোল আলু, মিষ্টি আলু, মেটে আলু, বিভিন্ন ধরণের কচু, মিষ্টিকুমড়া ইত্যাদি।

আমিষের উৎস : সীম জাতীয় সবজি, যেমন দেশী সীম, বরবটি, মটরশুটি ইত্যাদি আমিষের উল্লেখযোগ্য উৎস। তাছাড়াও আছে পটল, সজিনা, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ফুলকপি, মেথী ইত্যাদি। ফলের মধ্যে আছে আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, আমড়া, চালতা, কলা, জাম, পেঁপে, আনারস, কামরাঙ্গা ইত্যাদি।

আঁশের উৎস : খাদ্যে আঁশের উৎস হিসেবে প্রায় সব সবজির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আঁশযুক্ত শাক-সবজি কোষ্টকাঠিন্য দূর করে ত্বক সজীব রাখে এবং রুচি বর্ধন করে। সবজির আঁশ রক্তের কোলেস্টেরল এর মাত্রা কমিয়ে রাখে। তাছাড়া উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, পাকস্থলীর ক্যান্সার, গলব্লাডারের পাথর এবং ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণেই সবজিকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য বলা হয়।

ভিটামিনের উৎস : সাধারণত শাক-সবজিতে ভিটামিন-'এ' (ক্যারোটিন), ভিটামিন-'বি' এবং ভিটামিন-'সি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

খনিজের উৎস : সবজি ও মসলাতে বিভিন্ন প্রকার খনিজ বিশেষ করে আয়রণ, লৌহ এবং ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বেশী থাকে। যেমন- ডাঁটা, লালশাক, পেঁয়াজ, ধনিয়া, মূলাশাক, গিমাকলমী, কচুপাতা ইত্যাদি খনিজের ভালো উৎস। ঢেঁড়শ, পেঁয়াজ, ওলকপি, বীট ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায় যা গলগন্ড রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

১.১.৩ বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা:

১.১.৩.১ ভিটামিন- 'এ' এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা:

ভিটামিন 'এ' স্নেহে দ্রবনীয় কিন্তু পানিতে অদ্রবনীয়। ভিটামিন 'এ' এর উৎস হচ্ছে সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূল। প্রাণীজ ও উদ্ভিজ খাদ্য উৎস হতে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। প্রাণীজ খাদ্যে ভিটামিন 'এ' রেটিনল রূপে থাকে। উদ্ভিদ খাদ্যের মধ্যে ভিটামিন 'এ' ক্যারোটিন রূপে থাকে। যেমন- মিষ্টি কুমড়া, গাজর, লাল শাক, সবুজ শাক , ধনে পাতা, মিষ্টি আলু, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, আম এবং এই জাতীয় খাদ্যে ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। রঙিন উদ্ভিদে এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ থাকে যাকে ক্যারোটিন বলে।

ভিটামিন 'এ' এর কার্যাবলি :

ভিটামিন 'এ' দেহের আবরক কলার গঠনে ও রক্ষণাবেক্ষণে, হাড়ের বৃদ্ধি সাধন ও দাঁতের এনামেলের গঠনে, স্বল্প আলোতে দেখতে, ত্বকের মসৃণতা রক্ষায় বিশেষ করে পরিপাকতন্ত্র, শ্বাসতন্ত্র, মূত্র ও প্রজনন তন্ত্রের মিউকাস ঝিল্লির সুস্থতা রক্ষা করে।

ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

চোখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে চোখ শুষ্ক হয়ে যায়। অল্প আলোতে দেখার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া রাতকানা রোগ দেখা দেয়। ভিটামিন **'এ'** এর অভাব চলতে থাকলে চোখের কর্ণিয়ার আচ্ছাদন ঘোলাটে হয়, চোখে প্রদাহ হয়, কর্ণিয়াতে আলসারের সূচনা হয় এই অবস্থাকে জেরপথ্যালমিয়া বলে। পরবর্তীতে চোখে জীবানুর আক্রমণে পূঁজ তৈরি হয় ও কর্ণিয়া ফেটে যায়। একে কিরাটোম্যালেশিয়া বলে এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে চোখ অন্ধ হয়ে যায়। ভিটামিন **'এ'** এর অভাবে চোখের অসুখ ছাড়াও চামড়ায় লোমকূপের গোড়ায় ছোট ছোট গুটির সৃষ্টি হয়। যাকে ফলিকুলার হাইপারক্যারাটোসিস বলে।

তবে অতিরিক্ত ভিটামিন **'এ'** গ্রহণে দেহে বিষাক্ততা দেখা দেয়। বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, মাথা ব্যথা, চামড়ার শুষ্কতা, হাড়ের ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। গর্ভকালীন সময়ে অতিরিক্ত ভিটামিন **'এ'** ভ্রূনের ক্ষতি সাধন করে।

পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে ভিটামিন **'এ'** এর দৈনিক মাথাপিছু প্রাপ্যতা মাত্র ৭৬০ আই. ইউ (I.U) অথচ সুপারিশকৃত পরিমাণ হচ্ছে ২৩০০ আই.ইউ (I.U)। আমাদের দেশে প্রতি বছর ৯ লক্ষ শিশু রাতকানা রোগে এবং ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যায়।

১.১.৩.২ ভিটামিন 'বি-১' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা:

ভিটামিন **'বি'** এর রাসায়নিক নাম 'থায়ামিন'। থায়ামিন শরীরের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে একটি সহ-উৎসেচক হিসেবে কাজ করে। তাড়াতাড়ি দ্রবীভূত হয় বলে পানিতে এই ভিটামিন নষ্ট হয়। শুষ্ক অবস্থায় থায়ামিন অনেকদিন পর্যন্ত রাখা যায়। ভিটামিন **'বি-১'** এর সুলভ ও প্রাকৃতিক উৎস হলো গোটা শস্য, শস্যের খোসা, বাদামের বীচি, ডাল, বৈঁচী, সয়াবিন, আলু, শালগম, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, গাজর, লাউ, মটর, পালংশাক ইত্যাদি।

ভিটামিন 'বি-১' এর কার্যাবলী :

থায়ামিন দেহের গ্রন্থি ও পেশীর কার্যক্ষমতা, স্নায়ুতন্ত্র, হৃদপিন্ড ও পরিপাকতন্ত্রের সুস্থতা রক্ষা করে এবং খাদ্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে।

ভিটামিন 'বি-১' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

বেরিবেরি, দূর্বলতা, বুক ধরফর করা, হাত পা ব্যথা করা ইত্যাদি ভিটামিন **'বি-১'** এর অভাবে হয়।

অতিরিক্ত ভিটামিন **'বি-১'** গ্রহণে পেশীর অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়।

পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে ভিটামিন **'বি-১'** এর চাহিদা প্রতি ১০০০ কিলোক্যালরির জন্য ০.৪ মিলি গ্রাম শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে অতিরিক্ত ০.২ মিলি গ্রাম ও ০.৫ মিলি গ্রাম প্রয়োজন হয়।

১.১.৩.৩ ভিটামিন 'বি-২' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'বি'** এর রাসায়নিক নাম 'রিবোফ্লাবিন'। রিবোফ্লাবিন হলদে সবুজ বর্ণের দানাদার পদার্থ যা

পানিতে দ্রবনীয়। সুর্যের আলোতে এই ভিটামিন সক্রিয়তা হারায়। রিবোফ্লাবিন এর উৎসগুলো হল- সবুজ রঙের শাক সবজি, অঙ্কুরিত দানা, বাদাম, মটরশুটি, শতমূলী, কলা, পপকর্ন, সীম ইত্যাদি।

ভিটামিন 'বি-২' এর কার্যাবলী :

রিবোফ্লাবিন শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য হতে শক্তি উৎপাদন, লোহিত রক্তকণিকা তৈরি এবং কোষের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, ত্বক, চোখ, স্নায়ু প্রভৃতির সুস্থতা রক্ষা করে।

ভিটামিন 'বি-২' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

ঠোঁটের দুইপাশে ও তালুতে ফাটল, জিহ্বা লাল ও ফুলে উঠা, নাকের দু'পাশের ত্বক খসখসে ও চুলকানি, চোখে প্রদাহ ও পানি পড়া, হজমে ব্যঘাত, স্নায়ুবিক অস্থিরতা, ক্ষুধামন্দা ও গলা শুকিয়ে যায়।

পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে ভিটামিন **'বি-২'** এর চাহিদা প্রতি ১০০০ কিলোক্যালরির জন্য ১.৩-১.৭ মিলিগ্রাম দরকার হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অতিরিক্ত ০.২ মিলিগ্রাম এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে অতিরিক্ত ০.৪ মিলিগ্রাম বেশি দরকার হয়।

১.১.৩.৪ ভিটামিন 'বি-৩' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন 'বি-৩' এর রাসায়নিক নাম 'নায়াসিন' যা পানিতে দ্রবণীয় তবে তাপ, আলো, বাতাস, এসিড বা ক্ষারে মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। দেহে এর সঞ্চয় কম হয় বলে প্রতিদিন এর সরবরাহের প্রয়োজন। টমেটো, লেটুস, পালং শাক, লালশাক, সজিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি আলু, ব্রোকলি, শতমূলী, মাশরুম ইত্যাদি হতে ভিটামিন **'বি-৩'** পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি-৩' এর কার্যাবলী :

ফ্যাটি এসিড, কোলেস্টেরল, স্টেরয়েড হরমোন প্রভৃতির সংশ্লেষণে, ত্বক, অন্ত্র, স্নায়ুকলার ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে ও খাদ্য হজমে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'বি-৩' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

দেহে নায়াসিনের অভাব হলে ক্ষুধামন্দা, ক্লান্তিবোধ, বদহজম, অস্থিরতা, ডাইরিয়া এবং চর্মরোগ দেখা দেয়। অনেকদিন ধরে নায়াসিনের অভাব হলে পেলেগ্রা রোগ হয়। এই রোগে ত্বক, পরিপাক তন্ত্র এবং স্নায়ুবিক পেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আবার অতিরিক্ত ভিটামিন **'বি-৩'** গ্রহণে লিভার নষ্ট হয়।

পুষ্টি জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে ভিটামিন **'বি-৩'** এর চাহিদা প্রতি ১০০০ কিলোক্যালরির জন্য ১৮.২ মিলি গ্রাম। শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য অতিরিক্ত ১৫.১ মিলি গ্রাম এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে ১৮.১ মিলি গ্রাম প্রয়োজন।

১.১.৩.৫ ভিটামিন 'বি-৬' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন 'বি-৬' পানিতে দ্রবনীয়, এসিড ও ক্ষারে মোটামুটি স্থিতিশীল হলেও আলো, উচ্চ তাপে ও অক্সিজেনের সংস্পর্শে নষ্ট হয়। বাঁধাকপি, ব্রোকলী, সীম, মটরশুটি, মুলা, কলা, শালগম ইত্যাদিতে ভিটামিন **'বি-৬'** পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি-৬' এর কার্যাবলী :

হিমোগ্লোবিন তৈরিতে, স্নায়ুকলায় স্বাভাবিক ক্রিয়া বজায় রাখতে এবং প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'বি-৬' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

রক্তস্বল্পতা, উচ্চ রক্তচাপ, বিষণ্নতা, খিচুঁনী ও দুর্বলতা ভিটামিন **'বি-৬'** এর অভাবে হয়।

অতিরিক্ত ভিটামিন **'বি-৬'** গ্রহণে স্নায়ুকোষ নষ্ট হতে পারে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ১.৫-২.০ মিলিগ্রাম এবং গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে অতিরিক্ত ২.৫ মিলি গ্রাম ভিটামিন **'বি-৬'** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৩.৬ ভিটামিন 'বি-৯' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'বি-৯'** এর রাসায়নিক নাম হলো 'ফলিক এসিড বা ফলিনিক এসিড'। এই ভিটামিন সবুজ পাতা হতে পৃথক করা হয় বলে এর নাম 'ফলাসিন'। ফলিক এসিড হলুদ, দানাদার জাতীয় পদার্থ যা পানিতে সামান্য দ্রবনীয়। তবে তাপে স্থিতিশীল থাকলেও এসিডে ও আলোতে নষ্ট হয়। শতমূলী, ব্রুসেলস্পাউট, নলখল ইত্যাদি হতে ভিটামিন **'বি-৯'** পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'বি-৯' এর কার্যাবলী :

কোষের বৃদ্ধিতে ও বিভাজনে, লোহিত রক্ত কণিকা সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'বি-৯' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

রক্তস্বল্পতা, মুখের ভিতরে ও জিহ্বায় ঘা হওয়া এবং গর্ভস্থ শিশুর জন্মবিকৃতি ঘটে থাকে।

দৈনিক প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ২০০ মাইক্রো গ্রাম, গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ৪০০ ও ৩০০ মাইক্রো গ্রাম ভিটামিন **'বি-৯'** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৩.৭ ভিটামিন 'বি-১২' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'বি-১২'** এর অপর নাম 'সায়ানোকোবালমিন'। পানিতে দ্রবনীয়, স্বাদহীন, লাল দানাদার পদার্থ। তাপে স্থিতিশীল হলেও আলো, এসিড ও ক্ষারে কার্যক্ষমতা হারায়। খাদ্যের প্রোটিনে **'বি-১২'** থাকে, তাই এর একমাত্র উৎস হচ্ছে প্রানিজ খাদ্য।

ভিটামিন 'বি-১২' এর কার্যাবলী :

স্নায়ুকোষকে সুস্থ ও লোহিত রক্তকণিকার পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে, স্বাস্থ্যের বিকৃতি ও ক্ষুধা বৃদ্ধিতে, ডিএনএ তৈরিতে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'বি-১২' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

রক্তস্বল্পতা, মানসিক সমস্যা, ক্ষুধামন্দা, কোষ্ঠকাঠিন্য, স্মৃতিলোপ পাওয়া ইত্যাদি ভিটামিন **'বি-১২'** এর অভাবে হয়।

প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতিদিন কমপক্ষে ০.৬-১.২ মাইক্রোগ্রাম এবং গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ৩.০ ও ৫.০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন **'বি-১২'** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৩.৮ ভিটামিন 'সি' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'সি'** এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে 'এসকরবিক' এসিড। ভিটামিন **'সি'** কে স্কার্ভি প্রতিরোধক ভিটামিন ও বলা হয়। বিশুদ্ধ এসকরবিক এসিড সাদা, দানাদার, সহজেই পানিতে দ্রবীভূত হয়। এ ভিটামিন খুবই অস্থিতিশীল তাপ, আলো, বাতাস, ক্ষার ও ধাতবের সংস্পর্শে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। অক্সিজেনের সংস্পর্শে ভিটামিন **'সি'** জারিত হয়ে ডি-হাইড্রো এসকরবিক এসিডে পরিণত হয়। এ অবস্থায় এর গুনাগুন অনেকটা নষ্ট হয়ে পড়ে। ঠান্ডা ও এসিডিয় পরিবেশে ভিটামিন **'সি'** কিছুক্ষণ স্থিতিশীল থাকে। পানিতে দ্রবনীয় বলে শাকসবজি পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিলে বা সিদ্ধ করে পানি ফেলে দিলে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ পর্যন্ত ভিটামিন **'সি'** নষ্ট হয়। তাপে সংবেদনশীল বলে অনেকক্ষণ খোলা কড়াইতে রান্না করলে অথবা শাক-সবজি ৫-৭ দিন রেখে দিলেও ৫০ ভাগ পর্যন্ত ভিটামিন ক্ষয় হয়। আবার রান্না করা তরকারি চুলায় বসিয়ে রাখলে বা বারে বারে গরম করলেও ভিটামিন **'সি'** নষ্ট হয়। ফ্রিজে রাখা সবজি ও ফলের ভিটামিন নষ্ট হয় খুবই কম। আবার সবজি ও ফলে সামান্য চিনি মেশালে ভিটামিন **'সি'** অনেকটা বেড়ে যায়। এজন্য সালাদ ও নিরামিষে সামান্য চিনি দিলে এর স্বাদ যেমন বাড়ে তেমনি ভিটামিন **'সি'** নষ্ট হয় না। কচুশাক, মুলাশাক, সজিনাপাতা, ধনেপাতা, লাল শাক, খেসারি শাক, বথুয়া শাক, পালং শাক, লাউ শাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো ইত্যাদিতে ভিটামিন **'সি'** পাওয়া যায়। তবে আমলকিতে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন **'সি'** রয়েছে।

ভিটামিন 'সি' এর কার্যাবলী :

ভিটামিন **'সি'** দাঁত, হাড়, কোষের সংযোজনে দেহের ক্ষত বা ঘাঁ সারাতে লৌহ শোষণে, রক্তস্বল্পতা রোধে, যক্ষ্মা, শ্বাসতন্ত্র, ডিপথেরিয়া সংক্রমণ প্রতিরোধে, রক্তে চর্বি ও শর্করার মাত্রাকে কমাতে, চর্মরোগ সারাতে এবং কোষ প্রাচীরে আলফা টকোফেরল নিঃসরণে সাহায্য করে।

ভিটামিন 'সি' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

ভিটামিন **'সি'** এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এতে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায়, দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত ক্ষরণ হয় ও শিশুদের হাঁটুর জয়েন্টে ব্যাথা হয় ও ফুলে যায় এবং রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়।

অতিরিক্ত ভিটামিন **'সি'** গ্রহণে কিডনিতে পাথর হতে পারে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য দৈনিক ৪৫-৫০মিলি গ্রাম ও শিশু কিশোরদের জন্য ২০-৩৫ মিলিগ্রাম এবং গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ৫০মিলি গ্রাম ভিটামিন 'সি' গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৩.৯ ভিটামিন 'ডি' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'ডি'** পানিতে অদ্রবনীয় কিন্তু স্নেহ দ্রাবকে দ্রবনীয়। মানবদেহের ত্বকের নিচের কোলেস্টেরল হতে উৎপন্ন ৭-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে সক্রিয় ভিটামিন **'ডি-৩'** এ রূপান্তরিত হয়। এই ভিটামিন রক্তে সঞ্চালিত হয়ে বিভিন্ন কোষ কলাতে পৌছায়। এর নাম হচ্ছে

'কোলেক্যালসিফেরল' একে **'ডি-৩'** ও বলে। সূর্যের আলো ভিটামিন **'ডি'** এর অন্যতম একটি উৎস। তবে মাশরুম, পনির ও সূর্যমূখীর তেলেও ভিটামিন **'ডি'** পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ডি' এর কার্যাবলী :

হাড় ও দাঁতের মজবুতকরণে, পেশীকে সুদৃঢ় করতে এবং রক্তের ক্যালসিয়ামের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখতে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'ডি' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

শিশুদের রিকেট ও বড়দের অস্টিওম্যালেশিয়া, মাংসপেশীর দুর্বলতা, হাঁড়ে ফাটল, দাঁতের ভঙ্গুরতা এবং উচ্চ রক্তচাপ হয়ে থাকে। অতিরিক্ত ভিটামিন **'ডি'** গ্রহণে লিভার নষ্ট হতে পারে। শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ১০ মাইক্রোগ্রাম, প্রাপ্ত বয়স্কদের ৫ মাইক্রোগ্রাম ও গর্ভাবস্থায় ১০ মাইক্রোগ্রাম (৪০০ আই.ইউ) ভিটামিন **'ডি'** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৩.১০ ভিটামিন 'ই' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'ই'** চর্বিতে দ্রবনীয় কয়েক প্রকারের 'টোকোফেরল' জাতীয় জৈব উপাদান। বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলী, পুঁইশাক, ডাটাশাক ইত্যাদিতে ভিটামিন **'ই'** পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই' এর কার্যাবলী :

কোষের গঠন, কোষঝিল্লির কার্যক্ষমতা স্বাভাবিক রাখতে, রক্তকণিকা ও ফুসফুসের কোষের সুস্থতায়, এন্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে দেহের ক্ষতিকর উপাদান ধ্বংস, হৃদরোগ, ক্যান্সার, চোখের ছানি, ত্বকের লাবণ্য, চুলের উজ্জ্বলতা এবং বার্ধক্য প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'ই' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

পেশীর দূর্বলতা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, রক্তস্বল্পতা, চর্মরোগ, হৃদরোগ, চুল ঝরে পড়া ইত্যাদি দেখা দেয়। অতিরিক্ত ভিটামিন **'ই'** গ্রহণে পেটের সমস্যা হতে পারে।

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য দৈনিক ৩-৮ মিলিগ্রাম প্রাপ্ত বয়স্কদের ও গর্ভাবস্থায় ৮-১৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন **'ই'** গ্রহণ করা স্বাস্থ্যসম্মত।

১.১.৩.১১ ভিটামিন 'কে' এর উৎস, কার্যাবলী ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা :

ভিটামিন **'কে-১'** উদ্ভিদের সবুজ পাতায় পাওয়া যায়। হলুদ বর্ণের এই ভিটামিন পানিতে অদ্রবনীয় কিন্তু স্নেহ দ্রাবকে দ্রবণীয়, তাপ, এসিড ও ক্ষারে কিছুটা স্থিতিশীল হলেও আলোতে নষ্ট হয়। যকৃতে ভিটামিন **'কে'** জমা থাকে। লেটুস, বাঁধাকপি, ফুলকপি, গাজর, মটরশুটি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন **'কে'** থাকে।

ভিটামিন 'কে' এর কার্যাবলী :

রক্তজমাটকরণ, রক্তক্ষরণ বন্ধ, কিডনিতে পাথর হওয়া থেকে রক্ষা, হাঁড় ও দাঁতের গঠনে এবং দেহের ক্যালসিয়ামের পরিমাণ স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'কে' এর অভাবজনিত লক্ষণ :

ভিটামিন **'কে'** এর অভাব হলে রক্ত জমাটকরণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং সামান্য আঘাতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।

শিশুদের জন্য দৈনিক ১২ মাইক্রোগ্রাম এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ৭০-১৪০ মাইক্রোগ্রাম ভিটামিন **'কে'** গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১.১.৪ বিভিন্ন খনিজ লবণ এর উৎস ও প্রতিরোধ ক্ষমতা :

দেশীয় শাক-সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। ক্যালসিয়াম মানবদেহের হাড় ও দাঁত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম লালশাক, মিষ্টি আলুশাক ও মেথিশাকে ৩৫০-৪০০ মিলিগ্রাম, রাধুনীশাক, ধনেপাতা, সরিষাশাক, বথুয়াশাক, খেসারিশাক ও থানকুনি পাতায় ১০০-২০০ মিলিগ্রাম এবং দেশীয় অন্যান্য শাকসবজিতে ১০০ মিলিগ্রামের কম ক্যালসিয়াম থাকে। পুষ্টিবিদদের মতে, একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের প্রতিদিন ৪৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন। আমাদের দেশের জনগনের লৌহ প্রাপ্তির প্রধান উৎস শাক-সবজি। লৌহ মানবদেহে রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরি ও অক্সিজেন পরিবহণের জন্য দরকার। বাংলাদেশে শতকরা ৭০ ভাগ মহিলা ও শিশু লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভোগে। প্রতি ১০০ গ্রাম শাক-সবজির মধ্যে ধনেপাতা, সরিষাশাক, মেথিশাক, পালংশাক ও মিষ্টি আলুশাকে ১০-১৮ মিলিগ্রাম, কলাইশাক, রাধূনীশাক, বথুয়াশাক, পিঁয়াজের কলি ও সজিনা পাতাতে ৫.০-৭.০ মিলিগ্রাম এবং শীতকালীন অন্যান্য শাক-সবজিতে ৫.০ মিলিগ্রামের কম লৌহ থাকে। একজন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষের দৈনিক ৯ মিলিগ্রাম ও একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলার ১৮ মিলিগ্রাম লৌহ প্রয়োজন। দেশীয় শাক-সবজিতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন **'ই'** ও ভিটামিন **'কে'** থাকে। ভিটামিন **'ই'** প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে ও বার্ধক্য ঠেকাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন **'কে'** রক্তক্ষরণ তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে ও ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে। বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রোকলি ও পালং শাকে ভিটামিন **'ই'** ও ভিটামিন **'কে'** থাকে।

১.১.৫ দেশীয় ফলের গুরুত্ব :

মানবদেহে পুষ্টি সরবরাহ করে ত্বক কোমল, মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখতে, দেহকে রোগমুক্ত ও মনকে প্রফুল্ল রাখতে, বার্ধক্য ঠেকাতে, প্রজনন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং দীর্ঘায়ুর জন্য দেশীয় ফলের ভূমিকা অতুলনীয়।

অর্থাৎ সুস্থ সবল থাকতে বারো মাসই ফল খাওয়া জরুরী। আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, 'ফলে পুষ্টি, ফলে বল'। তাছাড়া রোগবালাই প্রতিরোধক খাদ্য হিসেবে ফল সর্বজন স্বীকৃত। আমাদের দেশের

শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক লৌহের অভাবে রক্তস্বল্পতায় ভোগে। তাছাড়া শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ শিশুই অপুষ্টির শিকার। ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে সহায়ক। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের জন্য দৈনিক ৬০ গ্রাম ফল খাওয়া দরকার। কিন্তু আমরা খেতে পাই মাত্র ৩৫ গ্রাম। দেশী ফল বিদেশী ফলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বরং পুষ্টি বিবেচনায় বিদেশী ফলের চেয়ে দেশী ফল অনেক গুণ ভাল। দেশী ফলের সাথে বিদেশী ফলের পুষ্টিমান তুলনা করে দেখা যায় যে প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী পেয়ারায় ক্যারোটিন (ভিটামিন-এ) থাকে ১০০ মাইক্রোগ্রাম আর ভিটামিন-সি থাকে ২১০ মিলিগ্রাম। সম আকৃতির বিদেশী ফল হচ্ছে আপেল। প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী আপেলে ক্যারোটিন (ভিটামিন-এ) আদৌ নেই এবং ভিটামিন-সি আছে মাত্র ৪ মিলিগ্রাম। এ হিসাব অনুযায়ী আপেলের প্রায় ৫০ গুণ বেশী ভিটামিন আছে পেয়ারায়। তাছাড়া ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী আঙ্গুরে ভিটামিন-সি আছে ২৯ মিলিগ্রাম আর দেশী বরইয়ে আছে ৫১ মিলিগ্রাম যা আঙ্গুরের প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং সুস্থ, সবল ও মেধাবী জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশী ফল বেশি উৎপাদন করতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেককে প্রয়োজন অনুযায়ী ফল খেতে হবে।

১.১.৬ দেশীয় ফল ও শাক-সবজির অপ্রচলিত কতিপয় উপকারিতা :

ফলের নানারকম ঔষধি গুণ আছে। আমরা বিদেশী ফলের পুষ্টিমান বেশী বলে মনে করি। কিন্তু দেশীয় ফল পুষ্টিমানে বিদেশী ফলের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। প্রথমেই জাতীয় ফল কাঁঠালের বিষয়ে বলা যাক। কাঁচা ও পাকা কাঁঠাল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। লিচু মুখের রুচি বৃদ্ধি, ঠান্ডা ও সর্দি জ্বরে উপকারী। কাশি, পেট ব্যাথা, টিউমার ও গ্ল্যান্ডের বৃদ্ধি, বসন্ত রোগ দমনে ভূমিকা রাখে। আনারসে ব্রোমিলিন নামক হজমকারক পদার্থ থাকে। তাছাড়া এর রস গলা ব্যথা এবং ব্রংকাইটিসের সমস্যা উপশমে উপকারী। এটি অতিরিক্ত কফ গলিয়ে দেয়। মূত্রবর্ধক হিসেবে আনারসের রস কিডনির কার্যাবলী স্বাভাবিক রাখে। এটি কৃমি নাশক, বলকারক, পান্ডুরোগে উপকারী। সর্দিজ্বর সারাতে আনারস ওষুধের মত কাজ করে। তরমুজের রস জ্বর, সর্দি, ঠান্ডা ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তরমুজ-এর রসের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে শরীরে বাড়তি ইউরিক এসিড দূর করে। তরমুজে বিদ্যমান আয়রন ও ক্যারোটিন যথাক্রমে রক্তস্বল্পতা ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে। জাম রক্ত শোধন, ডায়াবেটিস, প্লীহা ও যকৃতের শক্তি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন রোগে উপকারী। কচি ও পাকা জাম পেটের আমাশয় ও দেহের ক্ষত শুকাতে সহায়তা করে। পেয়ারা ভিটামিন 'সি', পেকটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অন্যতম উৎস। পেয়ারা চর্বি ও কোলেস্টেরল কমায়, ত্বক মসৃন করে, চর্মজনিত রোগ, দাঁত ও হাড়ের রোগ সারায় ও প্রতিরোধ করে। বেল পেট পরিষ্কার এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। বেল পাতার রস জন্ডিস, শ্বাসকষ্ট ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পেঁপেতে বিদ্যমান পেপেইন এনজাইম প্রোটিন হজম করে। পেঁপের ফিব্রিন রক্ত জমাট বাঁধতে ও ক্ষত সারাতে সহায়তা করে। কাঁচা পেঁপের রস আলসার ও আন্ত্রিক বৈকল্য নিরাময় করে। আমড়াতে প্রচুর পরিমাণে ক্যারোটিন, ভিটামিন 'সি', ক্যালসিয়াম ও খাদ্যশক্তি আছে। আমড়া ক্ষত সারাতে, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে ও ত্বকের জন্য উপকারী। জাম্বুরা কোষ্ঠকাঠিন্য ও চর্মরোগ প্রতিরোধ করে। ডালিমের রস কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয় পেটের অসুখের জন্য উপকারী। এটি পাতলা পায়খানা, আমাশয় ও রক্ত ক্ষরণ বন্ধে সহায়ক। তেতুঁল দেহের কোলেষ্টেরল কমায় বলে হৃদরোগীদের জন্য খুব উপকারী।

পুরানো তেতুঁলে কাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা, আমাশয় ও পেটের গ্যাসে উপকারী। আতাফলে সব ধরণের পুষ্টি আছে। আতা বল ও রক্ত বর্ধক। পাকা কলা মেধাশক্তি বাড়ায়, হৃদরোগ ও ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন **'ডি'** ও পটাসিয়াম আছে যা খুসকি, একজিমা ও পাঁচড়াজনিত চর্মরোগ প্রতিরোধ করে। করমচা মুখের রুচি বৃদ্ধি করে ও কৃমিনাশক হিসেবে কাজ করে। কামরাঙ্গাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন **'সি'** ও আয়রণ আছে যা ত্বক মসৃণ করে, ক্ষত, পাঁচড়া, ঘা শুকাতে সাহায্য করে। আমলকি যকৃত, পেটের পিড়া, সর্দি, কাশি, গ্যাষ্ট্রিক, জন্ডিস, মাথার চুলপড়া, অনিদ্রা ইত্যাদি রোগের ঔষধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আমলকি চর্মরোগ, মুখে ঘা, দাঁত দিয়ে রক্ত পড়াসহ বিভিন্ন রোগের জন্য খুবই উপকারী। ডাবের পানি দেহে ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়ামের অভাব দূর করে। ডায়রিয়া, কলেরা ও বমি হলে ডাবের পানির খনিজ পদার্থ দেহের ঘাটতি পূরণ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য, কিডনি ও প্রস্রাবের বিভিন্ন সমস্যার জন্য উপকারী। জামরুলের রস ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। এতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও ফসফরাস আছে। অরবরইয়ের রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, অরুচি, বহুমূত্র ও জ্বর নিরাময়ের জন্য উপকারী। চালতা চুল পড়া, মৃগী, বাতের ব্যাথা, পিত্ত বড় হওয়া সর্দিজ্বর ও কোষ্ঠকাঠিন্য নিরাময়ে সাহায্য করে। জলপাই রুচি বাড়ায়, ত্বক মসৃণ রাখে ও চর্মরোগের জন্য উপকারী। পাকা তাল মূত্র বৃদ্ধি করে প্রদাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। কদবেল যকৃত ও হৃদপিন্ডের বলবর্ধক। পিত্তরোগ ও পেটের অসুখ ভালো করে। কুল বাতের ব্যাথা, রক্ত পরিষ্কার, হজম, পেট ফাঁপা ও অরুচিতে উপকারী। সফেদা জ্বর নাশক, রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। ডেউয়া যকৃতের রোগের জন্য উপকারী। কলার মোচা আয়রণে ভরপুর। আয়রণ দেহে রক্ত বাড়ায়। রক্তের মূল উপাদান হিমোগ্লোবিনকে শক্তিশালী করে। ত্বক, চুল ভাল রাখতে এই সবজির আয়রণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এতে ক্যালসিয়াম, আয়োডিন, ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণও রয়েছে। এই উপকরণগুলো দাঁতের গঠনেও অগ্রণী ভূমিকা রাখে। লেটুসপাতা কফ, কাশি, ভাইরাস জ্বর, হাঁপানি ও ফুসফুসের ইনফেকশন দূর করে। পাটশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড ও ফলিক এসিড। অন্যান্য শাকের তুলনায় পাটশাকে ক্যারোটিন বেশী থাকে। এই ক্যারোটিন মুখের ঘা দূর করে, পাটশাক টিউমার ও ক্যান্সারের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। পাটশাক খাবার তাড়াতাড়ি হজম হতে সহায়তা করে এবং খাবারের রুচি বাড়ায়। নিয়মিত পাটশাক খেলে শরীরে বাতের ব্যথা হয়না। রক্ত পরিষ্কারক হিসেবে পাটশাক কাজ করে। ম্যাগনেসিয়াম ডায়াবেটিক ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, অনিদ্রা দূর করে, মানসিক চাপ ও শরীর সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। পাটশাকে বিদ্যমান ফলিক এসিড ত্বক ও চুল ভালো রাখতে সাহায্য করে। কচুশাকে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন **'এ', 'বি', 'সি'**, ক্যালসিয়াম ও আয়রণসহ অন্যান্য পুষ্টিগুণ। প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণের যোগান ছাড়াও এ শাক বিভিন্নরোগের পথ্য হিসেবেও ভূমিকা রেখে আসছে। পর্যাপ্ত আঁশ থাকায় কচুশাক মানবদেহের পরিপাকতন্ত্রের প্রক্রিয়ায়ও কার্যকর ভূমিকা রাখে। কচুশাক ছাড়াও এর মাটির নিচের অংশটিতেও (কচুমুখী) রয়েছে স্বাস্থ্যকর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ উপাদান।

ফলের পুষ্টিমান তালিকা

(প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী অংশে, মিলিগ্রাম)

ফলের নাম	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্য শক্তি (ক্যালরি)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	ক্যারোটিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন	
								বি-১ (মি. গ্রাম)	সি (মি. গ্রাম)
আম	০.৪	১৬.৯	৭৪	১৪	১৬	১.৩	২৭৪৩	০.০৮	১৬
আমড়া	০.৫	৪.৫	৪৮	৩৬	১১	৩.৯	২৭০	০.০২	২১
আনারস	০.২০৪	৬.২	৪৬	৩০	১৮	-	-	১৮৩০	২১
আমলকি	০.৫	১৩.৭	৫৮	৫০	২০	১.২	৯	০.০৩	৬০০
কালো জাম	০.৫	৬.৭	৩৭	৩০	২০	৪.৩	৭	-	৯
কদবেল	২.২২	৮.৫৯	৪৯	৫৯	-	০.৬	-	০.৮০	১৩
কাঁঠাল	০.৯	১৯.৮	৮৮	২০	৪১	০.৫	১৭৫	০.০৩	৭
কাগজি লেবু	০.৩	১১.১	৫৭	৭০	১০	২.৩	০	০.০২	৩৯
কলা	০.৮	২৭.২	১১৬	১৭	১১০	১.৫	১১	০.০৯	১
জাম্বুরা	০.৫	১০.২	৪৪	৩০	৩০	০.৪	১২০	০.০৩	২০
তরমুজ	০.৩	৩.৩	১৬	১১	১২	৭.৯	-	০.০২	১
চালতা	০.৮	১৩.৪	৫৯	১৬	২৬	-	-	-	-
পেয়ারা	০.৭	১১.২	৫১	১০	২৮	১০৪	-	০.০৩	২১২
পেঁপে (পাকা)	০.৫	৭.২	৩২	১৭	১৩	০.৫	৬৬৬	০.০৪	৫৭
বেল	১.৭	৩১.৮	১৩৭	৮৫	৫০	০.৬	৫৫	০.১৩	৮
পানি ফল	১.১	২৩.৩	১১৫	২০	১৫০	০.৮	১২	০.০৫	৯
বরই	০.৩	১৭.০	৭৪	৪	৯	১.৮	২১	০.০২	৭৬
লেবু	০.৬০	১০.৪	৪৭	৪০.০	-	২.৩	-	-	৪৭
লিচু	০.৫	১৩.৬	৬১	১০	৩৫	০.৭	-	০.০২	৩১

উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই (খন্ড-২), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, ঢাকা।

সবজির পুষ্টিমান তালিকা

(প্রতি ১০০ গ্রাম আহার উপযোগী অংশে, মিলিগ্রাম)

সবজির নাম	খনিজ পদার্থ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্য শক্তি (ক্যালরি)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	ফসফরাস (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	ক্যারোটিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন	
								বি-১ (মি. গ্রাম)	সি (মি. গ্রাম)
কচুর মুখী	-	২৬৬	২১.৫	-	-	-	-	০.০৪	-
কচু	১.৭	২১.১	৯৭	৪০	১৪০	১.৭	২৪	০.০৯	-
গাজর	১.১	১০.৬	৪৮	৮০	৫৩০	২.২	১৮৯০	০.০৪	৩
আলু	০.৬	১২.৬	৯৭	১০	৪০	০.৭	২৪	০.১০	১৭
মূলা	০.৯	৬.৮	৩২	৫০	২০	০.৫	৩	০.০৬	১৭
মিষ্টি আলু	১.০	২৮.২	১২০	৪৬	৫০	০.৮	৬	০.০৮	২৪
শালগম	০.৬	৬.২	২৯	৩০	৪০	০.৪	-	০.০৪	৪৩
উচ্ছে	১.০	১৬.৯	১১৬	৫৭	১৬৪	১.১	৪৬৯	০.৩২	২৫
কচুর লতি	১.২	৩.৬	১৮	৬০	২০	০.৫	১০৪	০.০৭	৩
কাঁচা মরিচ	১.০	৩.০	২৯	৩০	৮০	১.২	১৭৫	০.১৯	১১১
পেঁপে (কাঁচা)	০.৫	৫.৭	২৭	২৮	৪০	০.৯	০.০১	-	-
কাঁচা কলা	০.৫	১৪.০	৬৪	১০	২৯	০.৬	৩০	০.০৫	২৪
কচি কাঁঠাল	০.৯	৯.৪	৫১	৩০	৪০	১.৭	-	০.০৫	১৪
কাঁকরোল	০.৮৬	১৭.৩৫	৮০	৩৬	-	-	৪১০	০.০৮	-
করলা	০.৮	৪.২	২৫	২০	৭০	১.৮	১২৬	০.০৭	৮৮
চাল কুমড়া	০.৩	১.৯	১০	৩০	২০	০.৮	-	০.০৬	১
চিচিংগা	০.৫	৩৩	১৮	২৬	২০	.৩	৯৬	০.০৪	-
ঝিংগা	০.৩	৩.৪	১৭	১৮	২৬	.৫	৩৩	-	৫
ডাটা	১.৮	৩.৫	১৯	২৬০	৩০	১.৮	২৫৫	০.০১	১০
ঢেঁড়স	০.৭	৬.৪	৩৫	৬৬	৫৬	১.৫	৫২	০.০৭	১৩
ধুন্দল	.৩	৩.৫	১৭	৩০	০.৬	-	.০২	-	-
পটল	.৫	২.২	২০	৩০	৪০	১.৭	১৫৩	০.০৫	২৯
ফুলকপি	১.০	৪.০	৩০	৩৩	৫৭	১.৫	৩০	০.০৪	৫৬
বরবটি	০.৯	৮.১	৪৮	৭২	৫৯	২.৫	৫৬৪	৩.০৭	১৪
বেগুন	০.৩	৪.০	২৪	১৮	০.৯	৭৪	০.০৪	০.১১	-
মটর শুঁটি	০.৮	১৫.৯	৯৩	২০	১৩৯	১.৫	৮৩	০.২৫	৯
মিষ্টি কুমড়া	০.৬	৪.৬	২৫	১০	৩০	০.৭	৫০	০.০৬	২
শসা	০.৩	২.৫	১৩	১০	২৫	১.৫	-	০.০৩	৭
শিম (কচি)	০.৯	৬.৭	৪৮	২১০	৬৮	১.৭	১৮৭	০.১০	৯
সাজনা	২.০	৩.৭	২৬	৩০	১১০	৫.৩	১১০	০.০৫	১২০
টমেটো	০.৫	৩.৬	২০	৪৮	২০	০.৪	৩৫৮	০.১২	২৮

উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই (খন্ড-২), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর, ঢাকা।

১.১.৭ দেশীয় ফল ও শাক-সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব :

১.১.৭.১ কর্মসংস্থান :

যেহেতু নিবিড় সবজি/মসলা চাষ একটি অধিক শ্রমনির্ভর প্রক্রিয়া অর্থাৎ এ কাজে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন সেজন্য শাক-সবজি চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক ও মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে আমাদের দেশের বেকারত্ব সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে।

খাদ্য হিসাবে সবজি ও ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। সবজি ও ফলের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সঞ্চিত থাকে। আমাদের দেশের মানুষের পুষ্টিহীনতা দূর করার জন্য শাক-সবজি, ফলমূল উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারনে খাদ্য চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই বিকল্প খাদ্য হিসেবে আলু, মিষ্টি আলু, কচু ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

উদ্যান ফসল উৎপাদনের জন্য বাড়ির আশেপাশের জায়গাই যথেষ্ট। তাই অতি সহজে এসব ফসল উৎপাদন করা যায় এবং পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ করা যায়। আবার বাজারে ফল ও সবজি বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। বাড়ির আশেপাশে চাষ করা হয় বলে অতিরিক্ত শ্রমিকের দরকার হয় না। খরচও কম লাগে এবং লাভও বেশী করা যায়। সারাবছর উদ্যান জাতীয় ফসল থাকে বলে সারাবছরই অর্থের যোগান থাকে এবং পুষ্টির চাহিদা মেটানো সম্ভব। বেশীরভাগ ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাত করে বাজারজাত করা যায় বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে।

পরিবেশ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ফলবৃক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশে মোট চাষযোগ্য জমির পরিমানের ২% জমি ফল চাষে ব্যবহার করা হয় কিন্তু জাতীয় আয়ে কৃষি ফসলের ১০% আসে ফল থেকে। কাজেই ফল চাষ অধিক লাভজনক। আম, আনারস, কলা, পেয়ারা, কুল, নারিকেল, লিচু, পেঁপে, আমলকি, ডালিম, লেবু, আমড়া, জলপাই ইত্যাদি ফল চাষের মাধ্যমে অধিক লাভ সম্ভব। সবচেয়ে কম বিনিয়োগ ও কম ঝুঁকিতে ফল চাষ বেশি লাভজনক।

১.১.৭.২ সবজি চাষে তুলনামূলক আয়:

একর প্রতি শাক-সবজির ফলন তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় দানাদার শস্য, তৈলবীজ, ডাল ইত্যাদি চাষের চাইতে সবজি চাষে আয় অনেক বেশী হয়। শাক-সবজি উন্নত মানের গ্রেডিং ও ফসল উত্তলনের পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমিক পরিচর্যা ও প্যাকেজিং এর মাধ্যমে উন্নত মানের সবজি ও ফলের রপ্তানীর মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

১.১.৮ সবজি ও দানাদার শস্যের তুলনামূলক ফলন ও আয় :

সবজি	ফলন/একর (টন)	নীটআয় /একর	দানাদার শস্য	ফলন/একর (টন)	নীট আয় / একর (টাকা)
বাঁধাকপি	৩.৫১	১৫,৪৪৪.০০	বোরো (উফশী)	১.১০	৬০২২.০০
ফুলকপি	৩.২২	১৮,৪৩৪.০০	গম	০.৬৭	৩৮৩৫.০০
টমেটো	৩.০৯	২২,১৭০.০০	মসুর	০.৩০	৪২৮২.০০
বেগুন	২.৮	১৩,০৯০.০০	সরিষা	০.২৭	৪২৯৩.০০
মূলা	৩.৪৯	১২,৮২৫.০০			
পালং শাক	১.৮৯	৪,২৯৯.০০			

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (২০১৩ সালের মূল্য ও ফলন অনুযায়ী)

১.২ উদ্যান জাতীয় ফসল সংগ্রহের সময়, পরিপক্কতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা

⇨ **কি জানা যাবে:** উদ্যান ফসলের সংগ্রহের সময় পরিপক্কতা ও সাময়িক সংরক্ষণ পদ্ধতি।

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** উদ্যান ফসলের কর্তোনোত্তর ক্ষতি হ্রাস করতে।

মানুষের শরীর সুস্থ, সবল ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে ফলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য সঠিক সময়ে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা খুবই জরুরি। কিছু কিছু ফল আছে যেগুলো কাঁচা বা পাকা উভয় অবস্থাতেই খাওয়া যায়। অপরদিকে আম, জাম, লিচু, আনারস ইত্যাদি ফল কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায় না। এসব ফল পরিপূর্ণভাবে পুষ্ট হলেই গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হয়। কোন ফল শারীরতাত্ত্বিক পুষ্টতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত সংগ্রহ করা ঠিক নয়। এর আগে ফল সংগ্রহ করলে তার স্বাদ, রং, সুবাস ইত্যাদির ঠিকমত উন্নয়ন ঘটে না। আবার পাকা ফল সংগ্রহ করলে তা বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সঠিক সময়ে গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ফলের পুষ্টতা নির্ণয়ের ব্যাপারে একজন ফল চাষির সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

১.২.১ উদ্যান জাতীয় ফল সমূহ :

১.২.১.১ আম

ফল সংগ্রহের সময় : ফলের বোঁটার চারিদিকে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে অথবা যখন প্রাকৃতিকভাবে দুটো/একটা পাকা ফল গাছ থেকে পড়া শুরু হয় তখনই আম সংগ্রহ করার সময়। সাধারণত ফল ধরার ৯০-১২০ দিনের মধ্যে ফলগুলো পরিপক্ব হয়। আমের বোঁটার সংযোগ স্থলের অংশ বোটা থেকে উঁচু হলে আম সংগ্রহের সময় হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। তাছাড়া পরিপক্ব আমের কষের প্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম হয়। আমের শাসের রং ফলের শর্করার পরিমাণ অথবা আপেক্ষিক গুরুত্ব (১.০১ থেকে ১.০২) হলে আম সংগ্রহের সময় হয়েছে বলে বিবেচনা করা হয়।

বাছাইকরণ : সংরক্ষণ বা বাজারজাতকরণের আগে আম বাছাই করলে বিশেষ লাভবান হওয়া যায়। থেতলানো, পঁচা, গলা, ক্ষত, ফাটা প্রভৃতি ত্রুটিপূর্ণ আম প্রথমে আলাদা করতে হয়। তাছাড়া আমের আকার, আকৃতি অনুযায়ী বাছাই করে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করলে ভাল দাম পাওয়া যায়।

ফল সংরক্ষণ : পরিপক্ব সবুজ আম থেকে বোঁটা ছড়ালে বা কান্ড থেকে কাটলে প্রচুর পরিমাণে কষ বেরুতে থাকে। এ অবস্থায় সাথে সাথে আম পানিতে চুবিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এ পানিতে 'ইমাজেলিল' অথবা 'থায়া বেনডাজোল' (টিবিজেড) নামক ছত্রাক নাশক মেশাতে হবে। এতে 'এ্যানথ্রাকনোজ' রোগ প্রতিরোধ করা যাবে। এ রোগ প্রতিরোধে সাধারণত ০.১% টিবিজেড মেশানো ৫২-৫৬ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার পানিতে আমের জাতের ওপর নির্ভর করে ১-১০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে আমের সংরক্ষণ মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের জন্য একেবারে পেকে যায়নি এমন আম বাছাই করা

উচিত। বিভিন্ন আকারের ও জাতের আম একত্রে সংরক্ষণ বা বাজারজাতকরণ না করে বাছাই করলে তাতে অধিক মূল্য পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সে খড় বিছিয়ে তার মধ্যে আলতোভাবে আম সাজিয়ে বাজারে চালান দেওয়া হয়। সাধারণত প্রতিটি ঝুড়ি বা বাক্সে ১২-১৫ টি আম রাখা হয়। অনেক সময় পরিবহন ও স্থানান্তরের সময় যেন নষ্ট না হয় এজন্য দূরবর্তী স্থানে চালানের জন্য প্রতিটি আম টিস্যু কাগজ দ্বারা মুড়ে দেয়া হয়। এতে সংরক্ষণ গুণ বৃদ্ধি পায়। বিদেশে রপ্তানী করার জন্য করোগেটেড কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরী করে, বাক্সের গায়ে সুবিধামতো জায়গায় ছিদ্র রেখে আম প্যাকিং করলে আম ভাল থাকে।

হিমাগারে আম সংরক্ষণ: ল্যাংড়া, ফজলী প্রভৃতি আম প্যাকিং করে হিমাগারে ৭-৯ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা ও ৮৫-৯০% আদ্রতায় ৮-৯ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। এছাড়া হিমাগারে অক্সিজেন কমিয়ে ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সরবরাহ বাড়িয়ে আম অধিক সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তবে স্বাভাবিক ভাবে সংরক্ষণের আগে শতকরা ৪ ভাগ ঠান্ডা পানির সাথে মেশানো মোমের দ্রবণে আম ১ মিনিট ডুবিয়ে তারপর ভালভাবে শুকিয়ে নিতে পারলে যে কোন জাতের আমের সংরক্ষণ ক্ষমতা ৫০-১০০% বৃদ্ধি পায়।

১.২.১.২ কাঁঠাল

ফল সংগ্রহের সময়: বসন্তের শুরু থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত ইচোড় বা কাঁচাকাঁঠাল সংগ্রহ চলে। সাধারণত গ্রীষ্মের শেষ দিকে জুন মাসে ফল পাকা শুরু হয়। তখন ফলের বোঁটায় কিছু অংশ রেখে কান্ড থেকে ফল সংগ্রহ করা যায়। কাঁচা অবস্থায় হাত দিয়ে আঘাত করলে ঠন ঠন শব্দ হয়। আর পাকা অবস্থায় ড্যাব ড্যাব শব্দ হয়। ফুল ধরার ৯০-১১০ দিন পর কাঁঠাল পরিপক্ব ও পাড়ার উপযুক্ত হয়। গাছের কান্ড থেকে বোঁটা কেটে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়।

ফল সংরক্ষণ: স্বাভাবিকভাবে কাঁঠালকে কখনো হিমাগারে সংরক্ষণ করা যায় না। তবে ১১.১-১২.৭ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ও ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আদ্রতাযুক্ত ঘরে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কাঁঠালের কোষে থাকে প্রচুর 'পেক্টিন'। কোয়া থেকে নিংড়ানো রস দিয়ে জেলী তৈরি করা যেতে পারে। ফলের বর্জ্য পদার্থ যেমন খোসা ও মোথা বাণিজ্যিক ভাবে 'পেক্টিন' তৈরির কাজে ব্যবহার করা যায়।

১.২.১.৩ লিচু

ফল সংগ্রহের সময়: ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসে লিচু গাছে ফুল আসে এবং মে ও জুন মাসে পাকা ফল সংগ্রহ করা হয়। এ সময় ফলের খোসা লালচে রং ধারণ করে ও কাটাগুলো চ্যাপ্টা হয়ে খোসা প্রায় মসৃণ হয়ে যায়। কয়েকটি পাতাসহ গোছা ধরে লিচু সংগ্রহ করা হয়, এতে ফল বেশিদিন ধরে ঘরে রাখা যায়। বৃষ্টি হলে তার পর পরই কখনো লিচু সংগ্রহ করা ঠিক নয়।

ফল সংরক্ষণ: সাধারণত লিচু সংগ্রহের পর ২-৩ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। কেননা এতে লিচুর খোসা লাল উজ্জ্বল রং হারিয়ে বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং বাজার মূল্য কমে যায়।

তবে ১.২-৩.৩ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ৮০-৮৪% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় লিচু একমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, লিচু পাড়ার পর পরই যদি দ্রুত ঠান্ডা করা হয় এবং ২.৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় রাখা হয় তা ১ মাস পর্যন্ত ভাল থাকে। এছাড়া লিচু শুকিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। গাছ থেকে পাড়ার পর প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় রাখার ব্যবস্থা করলে লিচু দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিরোধ ও সংরক্ষণের সময় বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে :

(ক) ফল সংগ্রহের পরপরই ঠান্ডা করা।

(খ) প্লাষ্টিক ফিল্মের প্যাকেটে রেখে ফলের জলীয় পদার্থ বের হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া কমিয়ে রাখা।

গুদামের অনুমোদিত তাপমাত্রার হেরফের হয়, কিন্তু এক মাসের বেশি সময় ধরে ৫° সে. তাপমাত্রায় রাখলে ফলে ঠান্ডাজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। লিচুর লাল রং সবচেয়ে ভাল থাকে ৭°-১০°সে. তাপমাত্রায়। (তবে ঘরে ২০°-৩০°সে. পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রায় প্যাক করা লিচু এক সপ্তাহের মত সময় সংরক্ষণ করা সম্ভব, যদি গাছ থেকে সংগ্রহের পর ছত্রাক নাশক 'টি. বি. জেড' অথবা 'বেনোমাইল' প্রয়োগ করে প্লাষ্টিক ফিল্মের প্যাকেটে রাখা হয়।)

১.২.১.৪ পেয়ারা

ফল সংগ্রহের সময়: কলমের গাছ এক বছর থেকে এবং বীজের গাছ দুই বছরে ফল দিতে শুরু করে। এত ছোট গাছে ফল ধরতে দেয়া ঠিক নয়। পূর্ণ ফলবান হতে ৭/৮ বছর সময় লাগে। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল ও আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে গাছে ফুল আসে। ফুল আসার ৪-৫ মাসের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করা যায়। পাকা শুরু হলে ফল অতিদ্রুত অতিপক্ব হয়ে যায়। তাই দূরে চালান দেওয়ার জন্য পাকা শুরুর সাথে সাথেই ফল সংগ্রহ করা উচিত।

ফল সংরক্ষণ: সংগ্রহের পর অধিকাংশ জাতের ফলই ২-৩ দিনের বেশি ঘরে রাখা যায় না। এজন্য সংগ্রহের পরপরই বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে পাকার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করলে সাধারণভাবে এক সপ্তাহ পর্যন্ত ফল ভাল থাকে। ১০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ও ৮৫-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় পেয়ারা একমাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

১.২.২ লেবু জাতীয় ফল

১.২.২.১ লেবু

ফল সংগ্রহের সময়: অধিকাংশ লেবুজাতীয় ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির পর কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত গাছে বেশ টাটকা থাকে। পরিপক্ব ফল সংগ্রহ করে ভাল, খারাপ দেখে সর্টিং করে এবং ছোট বড় মাঝারী আকার দেখে গ্রেডিং করে বিক্রয় করলে ভাল মূল্য পাওয়া যায়।

ফল সংরক্ষণ: পরিণত ফলকে ১১ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কয়েকদিনের বেশি ফল ঘরে রাখা যায় না। তবে কাগজী লেবুর উপযোগী সংরক্ষণ তাপমাত্রা হলো ১৮ ডিগ্রী সে.।

১.২.২.২ কমলা

ফল সংগ্রহের সময়: ফল পুষ্ট হলেই রং বদলাতে শুরু করে। যতই পরিণত হবে ততই লালচে হলদে হবে। এছাড়া তৈল রন্ধ্রগুলো স্পষ্ট হবে। এই রকম অবস্থায় ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। দূরের বাজারে পাঠাতে একটু আগে অর্থাৎ রং ধরতে শুরু করলেই ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

ফল সংরক্ষণ: ফল সংগ্রহের পর ১১ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় এবং ৮০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় হিমাগারে দু'মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। ফল সংগ্রহের পর বোঁটা যতটা সম্ভব ছোট করে ছেটে ফেলতে হবে এবং ফলের গায়ে কোন আঁচড় লাগানো চলবে না। যদি ফল ১৩ শতাংশ তরল মোমে ডুবিয়ে সাধারণভাবে ঘরে রাখা হয় তাহলে ২৫ দিন রাখা যাবে আর ৫.৬ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় রাখলে ১০০ দিন ভালভাবে রাখা যাবে।

সাইট্রাস ফল, গাছ থেকে সংগ্রহের পরবর্তী কার্যপদ্ধতি

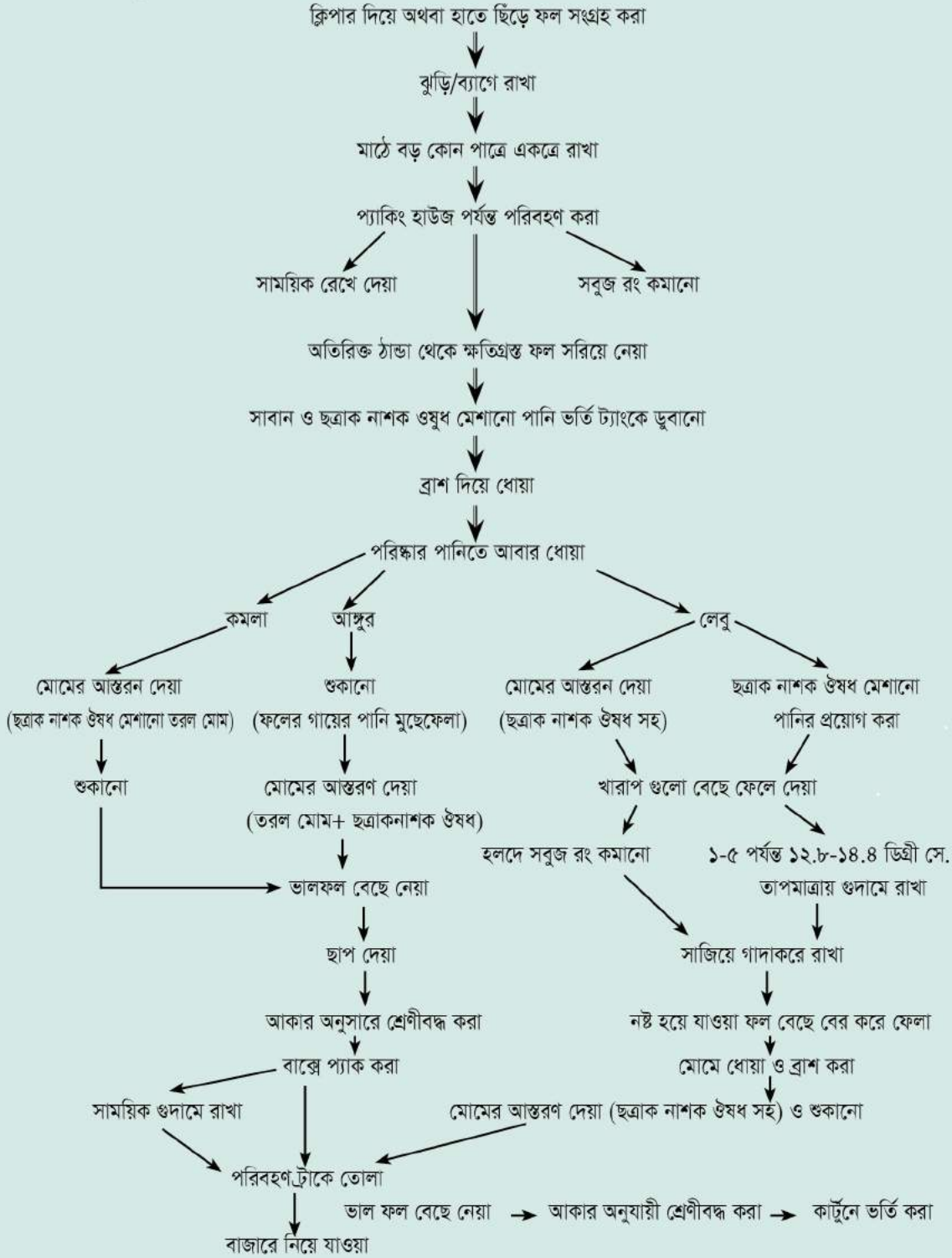

১.২.৩ অন্যান্য ফল সমূহ

১.২.৩.১ আমড়া

ফল সংগ্রহের সময়: দেশী আমড়া গাছে ৫-৭ বছরের মধ্যে আর বিলাতি আমড়া গাছে আরো আগেই ফল ধরতে শুরু করে। দেশী আমড়া ছোট অবস্থা থেকেই সংগ্রহ করা হয় চাটনি খাওয়ার জন্য। একটা গাছ ২০-২৫ বছর নিয়মিত ফল দেয় এবং তাতে দুটি জাতেরই আগষ্ট থেকে ফল পাকতে শুরু করে। তবে সঠিকভাবে পরিপক্ব হলে ফল পাড়া প্রয়োজন।

ফল সংরক্ষণ: ডাঁশা ফল পেড়ে মিষ্টি আচার তৈরী করে অনেকদিন রাখা যায়। ভেষজ চিকিৎসার জন্য আমের মত আমড়া যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়।

১.২.৩.২ কলা

কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল জাতীয় সবজি এবং বারো মাস ব্যাপী বাজারে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে সর্বত্রই সীমিত পরিমাণে এর চাষ হয়ে থাকে এবং বাগান ভিত্তিক চাষ হয়।

চারা লাগানো থেকে ৯-১০ মাসের মধ্যে গাছে ফুল আসে এবং পাকার উপযুক্ত হতে আরো ৩-৪ মাস সময় লাগে। তবে বিভিন্ন জাতের মধ্যে চারা বসানোর পর থেকে কাঁদি কাটা পর্যন্ত সময়ের তারতম্য ঘটে। মোটামুটি দেখাগেছে কাঁদি কাটতে লম্বা জাতের কলার ১৫-১৮ মাস সময় লাগে। কাঁদি আসার মোটামুটি ৩-৪ মাসের মধ্যে যখন কলা পুষ্ট হয়। শিরা মিলিয়ে যায় তখন কাঁদি কাটা হয়। ব্যবসা ভিত্তিক ফল চালান দেবার জন্য ফলের চার ভাগের তিন ভাগ বড় হলে ও শিরা মিলিয়ে গেলেই কাঁদি কাটা হবে। কাটার পর কলায় যেন ঘষা না লাগে বা চোট না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পাড়ার আগে প্রতিটি কলার কাদি ছিদ্র যুক্ত প্লাষ্টিক থলে দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় যাতে কলায় দাগ না লাগে। কলা পরিপক্ক অথচ সবুজ থাকা অবস্থায় পাড়া হয় এবং বাজারের কাছাকাছি জায়গায় অথবা বাজারে নিয়ে পাকানো হয়। যে বাজারে কলা পাকানো ও বিক্রি করা হবে সেখানে

নিতে যতটা সময়ের প্রয়োজন ততটা সময় হাতে রেখেই কলা গাছ থেকে পাড়া হয়। কলার প্রধানত চারটি পৃথক পৃথক পরিপক্বতার ধাপ আছে। সেগুলো নির্ধারণ করা হয় ফলের কোষের চেহারা দেখে। গাছ থেকে কলার কাদি পাড়ার সময় দু'জন মানুষের প্রয়োজন হয়। একজন কাটে, আর একজনকে কাঁদি ধরে নামাতে হবে। কাঁদি থেকে ছড়াগুলো যখন কাটা হয় তখন কষ বেরুতে থাকে। এ কষ যদি গড়িয়ে কলার গায়ে লাগে তাহলে কলায় দাগ পড়ে ও কলার চেহারা নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাটার সঙ্গে সঙ্গে কলার ছড়াগুলো পানিতে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এতে কষ পানিতে ধুয়ে যায় ও কলার গায়ে আর কষ লাগতে পারে না। তবে এ পানিতে 'থায়া বেনডাজোল (টিবিজেড) অথবা 'ইমাজেলিল' নামক ছত্রাকনাশক মেশাতে হবে। এ ছাড়া কাটা জায়গায় ফিটকিরী (এলাম) লাগানো যেতে পারে এতে কষ পড়া বন্ধ হবে। বাজার এলাকায় আসা পর্যন্ত কলার রং সবুজ থাকা উচিত। এখানে আসার পর বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে রেখে সব কলাকে একই সাথে সমানভাবে পাকানোর ব্যবস্থা করা হয়। 'ইথিলিন' ব্যবহার করলে পাকানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়। কলা পাকানোর জন্য কক্ষের তাপ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এজন্য কক্ষগুলো ভালভাবে তাপ পরিবহণরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন করে তৈরি করতে হবে। এতে কৃত্রিম তাপসৃষ্টি ও ঠান্ডা করার ব্যবস্থাও রাখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের ভিতরে বাতাস সঞ্চালনের ব্যবস্থাও করতে হবে। যাতে 'ইথিলিন' গ্যাস ভালভাবে ছড়ানোর ও ফলের শ্বসনজনিত সৃষ্ট তাপ বেরিয়ে যেতে পারে। কক্ষে বাতাসের আর্দ্রতা শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে। কলা পাকানোর ব্যবস্থা শুরু করা হয় কক্ষে ২৪ ঘন্টা ধরে 'ইথিলিন' গ্যাস দিয়ে। ঐ সময় কক্ষের তাপ ১৫.৫ থেকে ১৬.৫ ডিগ্রী সে. এর মধ্যে রাখতে হবে। কক্ষের বাতাসে ইথিলিনের পরিমাণ থাকতে হবে ১০০ থেকে ১০০০ পিপিএম এর মধ্যে। কলা কখনও বেশি সময় ধরে ১৩ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার নিচে রাখা উচিত নয়। এর নিচের তাপমাত্রায় রাখলে উজ্জ্বল হলদে রং এর পরিবর্তে মেটে হলদে রং এর হয়ে যায় ও একে ঠান্ডাজনিত ক্ষত বলে ধরে নেয়া হয়। এ ধরনের ক্ষত ও তার বহিঃপ্রকাশ বেশি করে ঘটে যদি পাকার আগে এ ধরনের ঠান্ডায় কলা বেশি সময় রাখা হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: কলা ১৩ ডিগ্রী সে. ও ৮৫ থেকে ৯৫ শতাংশ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় তিন সপ্তাহ রাখা যায়। আবার কলা ১৬.৫ থেকে ২১ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় রাখলে তাড়াতাড়ি পেকে যায়।চারা রোপনের ১০-১১ মাস পরে গাছে থোড় বের হয় এবং ১৩-১৪ মাস পরে সবজি হিসাবে কলা সংগ্রহ উপযোগী হয়। ফল হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সুবিধাজনক সময়ে সংগ্রহ পূর্বক বিপণন করা যায়। জাতভেদে প্রতিটি গাছে ৭০-১২০টি (১০-১৫ কেজি) কলা ও ৪-৫ টি চারা এবং হেক্টরে ১৫-২৫ টন কলা ও ৮-১০ হাজার চারা জন্মে।

১.২.৩.৩ পেঁপে

পেঁপে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাকা অবস্থায় উপাদেয় ফল ও কাঁচা অবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সবজি। আমেরিকার গ্রীষ্ম মন্ডলীয় এলাকায় এর উৎপত্তিস্থল। ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড,

চীন, হাওয়াই, ফ্লোরিডা প্রভৃতি স্থানে এটা অন্যতম প্রধান ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র এটা জনপ্রিয় এবং প্রধানত বসতবাড়ীর আশেপাশে চাষ করা হয়ে থাকে। সবজি হিসাবে কচি ফল সংগ্রহ করা হয়। পাকা ফলের জন্য ফলের ত্বক হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হয়। পেঁপে অতি মাত্রায় নাজুক অর্থাৎ সামান্য আঘাতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাক্সে ভর্তি করা ও পরিবহণের সময় অতি মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য। কারণ অসাবধানতা জনিত আঘাতে সৃষ্ট ক্ষত, ফলকে পুরোপুরি নষ্ট করে ফেলতে পারে। খারাপ চেহারা, আকার, আকৃতির পেঁপে বেছে আলাদা করা হয়। ফলের আকার চোখে দেখে স্থির করা হয়, তবে ওজনের সাহায্যেও আকার নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। একই আকারের ফল একত্রে প্যাকিং করে বাজার জাত করা ভাল। তবে প্রতিটি পেঁপে আলাদা আলাদা করে পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে পেঁচিয়ে প্যাকিং করলে আঘাতজণিত ক্ষত থেকে রক্ষা পাবে। ছত্রাকের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ৬০.৬ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় পানিতে ২০ সেকেন্ড চুবিয়ে নিতে হবে। এর বেশি সময় চুবিয়ে রাখলে ফলে তাপজনিত ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ঠান্ডায় পেঁপের গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। গুদাম ও পরিবহন যানের তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রী সে. এর নিচে নেমে গেলে ক্ষতের সৃষ্টি হয় ও তা যদি বেশি সময় ধরে অব্যাহত থাকে এ ক্ষতের পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ঠান্ডায় অপরিপক্ব ও পরিপক্ব সবুজ ফল বেশী নষ্ট হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ফসল সংগ্রহের পর পাকা পেঁপে মাটিতে না রেখে ঝুড়ি কিংবা পেঁপে গাছের পাতা ছিঁড়ে তার উপর রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় চটের ছালা মাটিতে বিছিয়ে ২ থেকে ৩ দিন পাকা পেঁপে রাখা যাবে। কাঁচা পেঁপে ৩ দিন পর্যন্ত রাখা যায় তবে পানিতে ভিজিয়ে কাঁচা পেঁপে ৪ থেকে ৫ দিন রাখা যায়। চারা রোপনের ৩ মাসের মধ্যে গাছে ফুল ও ফল ধরে আর ফুলধরার ২-৩ মাস পরে সবজি হিসাবে ও ৬-৭ মাস পরে পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। বাজার চাহিদা ও পরিবহন সুবিধার সাথে সংগতি রেখে গাছ থেকে ফল তোলা উচিত। ফল অবশ্যই বাছাই করে ও ছুরি দিয়ে বোঁটা কেটে সংগ্রহ করতে হয় এবং কষ লেগে ফলের গা যাতে কদাকার না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হয়। ফলের দুগ্ধবত কষ পাতলা ও জলীয় ভাব ধারণ করলেই পেঁপে পরিপুষ্ট ও পাড়ার উপযুক্ত হয়েছে বুঝা যায়। সংগৃহীত ফল ধীরে ধীরে পাকে। কাঁচা ও পাকা ফল বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে পরিবহন ও বিপণন করা বাঞ্চনীয়। গড়ে প্রতি গাছে ২০ কেজি ও হেক্টরে ৫০ টন কাঁচা পেঁপে জন্মে।

১.২.৩.৪ আনারস

ফল সংগ্রহের সময়: আনারস একটি যৌগিক ফল অর্থাৎ একটি আনারস অনেকগুলো ফলের সমষ্টি। আনারস গাছ সাধারণত ১০ মাস হতে ২২ মাসের মধ্যে ফল প্রদান করে জুলাই-আগস্ট মাসে চারা রোপন করা হলে পরবর্তী মে-জুন মাসে প্রায় এক পঞ্চমাংশ গাছ ফল উৎপন্ন করে। নভেম্বর মাসে

প্রায় এক চতুর্থাংশ গাছ ফল প্রদান করে এবং তার পরবর্তী মে-জুন মাসে প্রায় সব গাছ ফল প্রদান করে। আনারস কাঁচা বা অপরিপুষ্ট অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত নয়। কিছু রং ধরলে তবে আনারস সংগ্রহ করতে হবে। ফলের গোড়ার দিকের রং যখন সবুজ থেকে হলদে অথবা হালকা-বাদামি রং এ পরিণত হয় তখনই সাধারণত গাছ থেকে তোলা হয়। টাট্‌কা বিক্রির জন্য ফলের রং পুরোপুরি পরিবর্তিত হওয়ার আগেই তোলা হয়। আনারস একটি ''ননক্লাইম্যাকটেরিক'' ফল। এতে ফল তোলার পর ফলের উপাদানগত পরিবর্তন বলতে শুধু ফলের গায়ের রং (সবুজ থেকে হলদে/বাদামি) ও অম্লত্ব কমে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আনারস সংরক্ষণ: ১১ থেকে ১৩ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা ও ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ আর্দ্রতায় আনারস ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তবে লক্ষনীয় আনারস কাটার পর কর্তিত অংশ ১০% অ্যালকোহলের সাথে বেনজোয়িক এসিডের দ্রবণে সামান্য সময় ডুবিয়ে রাখলে ফল বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়।

ক্ষেত থেকে আনারস সংগ্রহের পরবর্তী কার্য পদ্ধতির ধারাবাহিক ধাপসমূহ

হাত দিয়ে সংগ্রহ করা

↓

ঝাঁকায় করে বহন করা

↓

নৌকা বা ভ্যানে বোঝাই করা

↓

প্যাকেজিং হাউজ অথবা প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় পৌঁছে দেয়া

↓

গাদা করে রাখা

↓

১-৩ সে. মি. পর্যন্ত ফলের বোঁটা কেটে ছোট করা

↓

মোমের আস্তরণ দেয়া অথবা ছত্রাকনাশক বেনজিমিডাজোল মিশ্রিত পানিতে ডুবানো

↓

গুনগত মান অনুযায়ী বেছে পৃথক করা

↓

আকার নির্ধারণ করা

↓

হাত দিয়ে কার্টুনে ভর্তি করা

(কার্টুনে দুই ফলের মাঝে নরম কিছু দেয়া যাতে একটা ফলের গায়ে আর একটা ফল না লাগে)

↓

ঠান্ডা করা

↓

বাইরে পাঠানোর জন্য যানবাহণে বোঝাই করে বাজারে পাঠানো

↓

উড়োজাহাজ অথবা জাহাজে করে বিদেশের বাজারে পাঠানো

১.২.৩.৫ তরমুজ

তরমুজ কুমড়া পরিবারের একটি সুমিষ্ট অর্থকরী ফল। তরমুজের উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা মহাদেশে। বর্তমানে তরমুজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে চাষ করা হচ্ছে। গাছ বর্ষজীবী, লতানো প্রকৃতির। প্রধানতঃ মৌমাছির সাহায্যে পরাগায়িত হয়। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় ব্যাপক ভাবে তরমুজের চাষ হয়ে থাকে। যত্নশীল হলে স্বল্প মেয়াদী গাছে টকটকে লাল, সুমিষ্ট ও আকর্ষণীয় তরমুজ উৎপাদন করে লাভবান হওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ৯০-১২০ দিন এবং মার্বেল আকার ধারণের ৩০ দিনের মধ্যে ফল পরিপক্বতা লাভ করলে সংগ্রহ করা যায়। মার্বেল আকার ধারণের তারিখ সম্বলিত লেভেল দেয়া থাকলে ৩০ দিন পর নিশ্চিত ভাবে পাকা ফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। তবে গাছের প্রথম ফল কিছুটা বিলম্বে পরিপক্ব হয় এবং উষ্ণ ও শুষ্ক পরিবেশে আগাম ও নাবি উভয় জাতের ফল কিছুটা আগে পরিপক্বতা লাভ করে ও অধিক মিষ্টি হয়। পরিপক্বতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ফল সংগ্রহ ও বিপণন করা উচিত নয়। এতে ক্রেতাদের প্রতারিত হবার আশঙ্কা থাকে। ফল ওজনে হালকা হওয়া, পানিতে ভেসে থাকা, আঙুলের টোকায় ড্যাব ড্যাব আওয়াজ করা, বোঁটার আঁকড়ি শুকানো, পিছনের দিকের ফুল ঝরে পড়া ও ত্বকের উজ্জ্বল্য পরিপক্বতার সুস্পষ্ট লক্ষণ। তাই পরিপক্বতা যাচাই করে বোঁটাসহ বিকেল বেলায় তরমুজ সংগ্রহ করা উত্তম। দূরবর্তী বাজারে প্রেরণের জন্য পুরাপুরি পাকার কিঞ্চিত পূর্বে ফল সংগ্রহ পূর্বক যথারীতি বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে দ্রুত বিপণন করতে হয়। আধুনিক প্রথায় হেক্টরে প্রায় ৪০-৫০ টন তরমুজ জন্মে।

১.২.৪ কপি জাতীয় সবজি

১.২.৪.১ বাঁধাকপি

কপি গোত্রের মধ্যে বাঁধাকপি অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বেশী পরিচিত এবং অধিক চাষ হয়। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বৎসর পূর্বে ইউরোপে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং ডেনমার্ক, গ্রীস, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে প্রধান কয়েকটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। আমাদের দেশের শহরাঞ্চলে বাঁধাকপি বেশী সমাদৃত। বাঁধাকপির চাষ প্রণালী ফুলকপির চেয়ে সহজ এবং একটু যত্নশীল হলেই লাভবান হওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: জাতভেদে চারা রোপনের ৫০ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে শক্তভাবে কপির মাথা বাঁধে ও সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। কোন কোন জাতের কপি বাঁধার পরেও কিছু দিন জমিতে রাখা যায়। তবে ঐ সময়ে জমিতে পানির পরিমাণ কোন কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে কপির মাথা ফেটে যেতে পারে। আগাম ফসল সংগ্রহে বিলম্ব করা ঠিক নয়। ধারালো ছুরি বা কাস্তে দিয়ে গোড়া কেটে বাঁধাকপি সংগ্রহ করা উত্তম। বাহির দিকের ৩/৪ টি সবুজ পাতাসহ ঝুড়ি বা পাতলা চটের থলেতে পুরে পরিবহন করতে সুবিধা হয় ও আহারোপযোগী অংশ অক্ষত থাকে। গরম অবহাওয়ায় কপি সংগ্রহ এবং গরম ও বায়ু চলাচল শূণ্য স্থানে সংরক্ষণ করা ক্ষতিকর। হিমায়িত গুদামে সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। ঠান্ডা গুদামে শুণ্য ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৯৫% থেকে ৯৮% এ বাঁধাকপি ভাল থাকে। এভাবে সংরক্ষণ করলে ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। এ ছাড়া শীতকালীন সাধারণ তাপমাত্রায় বাতাস চলাচল উপযোগী ছায়াযুক্ত স্থানে প্রায় ৩-৪ সপ্তাহ সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টরে আগাম ও গ্রীষ্ম মৌসুমে ২০-২৫ টন এবং মাঝারী ও নাবি মৌসুমে ৪০-৬০ টন কপি জন্মে।

১.২.৪.২ ফুলকপি

ফুলকপি একটি উৎকৃষ্ট শীতকালীন সবজি। যার আদিস্থান ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বহুদিন পূর্ব থেকে বাংলাদেশে ফুলকপি চাষ হচ্ছে। কিন্তু কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এর চাষ ও ফলন অত্যন্ত কম। কেননা উপযুক্ত জাত নির্বাচনপূর্বক সঠিক সময়ে ও সযত্নে আবাদ করা না হলে ফুলকপি চাষে সফল হওয়া যায় না।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : পুষ্প মঞ্জুরী ধবধবে সাদা ও বেশ দৃঢ় থাকা অবস্থায় সংগ্রহ ও বিপণন করা উচিত। বিলম্বে ফুল ফোঁটা কিংবা বিবর্ণ হয়ে সজীবতা হারিয়ে ফেললে বাজার দর অত্যন্ত কমে যায়। ফসল কাটার পর বাহিরের পাতাগুলোকে এমনভাবে কাটতে হয় যেন পাতা দ্বারা ফুল আবৃত থাকে এবং সূর্যালোকে বা পরিবহণ কালে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। উত্তমরুপে বাছাই করে বাঁশের ঝুড়িতে করে স্থানান্তর করলে ফুলকপির গুণাগুণ সহজে নষ্ট হয় না। হিমায়িত গুদামে সংরক্ষণ করলে ভাল হয়। ঠান্ডা গুদামে ৩২ ডিগ্রী ফা. অথবা শুন্য ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আর্দ্রতা ৯৫% থেকে ৯৮% এ ফুলকপি ভাল থাকে। জমি থেকে তোলার প্রায় সপ্তাহ খানেক পূর্বে নেপথালিন অ্যাসেটিক এসিড পাতায় ছিটিয়ে পরে ঠান্ডা গুদামে রাখলে প্রায় একমাস থেকে দেড়মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। আগাম মৌসুমে হেক্টরে ১০-১৫ টন আর নাবি মৌসুমে ২০-২৫ টন কপি এবং ৪০০-৬০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৪.৩ ওলকপি

ওলকপি একটি স্বল্প মেয়াদী শীতকালীন সবজি। উত্তর ইউরোপ এর উৎপত্তিস্থল, ষোড়'শ শতাব্দীর পূর্ব থেকে পরিচিত হলেও বাঁধাকপি ও ফুলকপির মত প্রচলিত ও সমাদৃত নয়। চাষ প্রণালী খুবই সহজ। কিন্তু বাংলাদেশে এর আবাদী এলাকা অত্যন্ত কম।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: চারা রোপনের ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওলকপি ২৫০-৩০০ গ্রাম ওজনের হলে সংগ্রহ করা চলে। তখন ওলকপি নরম, মোলায়েম ও সুস্বাদু থাকে। কিন্তু সংগ্রহে বেশী বিলম্ব করলে শাঁস আঁশাল, শক্ত ও স্বাদহীন হয়ে পড়ে। ওলকপি উঠানোর পর শিকড় কেটে বা ৪-৫ টি পাতা সমেত আঁটি বেঁধে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বাছাই করে বিক্রি করা উচিত। অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ওলকপি সংগ্রহ করা চলে। বাংলাদেশে ওলকপির বাজার সীমিত বিধায় একত্রে আবাদ না করে পর্যায়ক্রমে চাষ করা উচিত। হেক্টরে ২৫ থেকে ৩০ টন ওলকপি জন্মে।

১.২.৫ মূল জাতীয় সবজি

১.২.৫.১ মূলা

মূলা একটি বহুল প্রচলিত সরিষা পরিবারভুক্ত মূল জাতীয় সবজি। ভূমধ্যসাগরীয় মিশর বা গ্রীসে সম্ভবত এর উৎপত্তি স্থান। চীন, জাপান ও তৎসংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক চাষ হয় এবং বাংলাদেশে এটি অন্যতম প্রধান সবজি।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ফসল সংগ্রহের কোন বাঁধাধরা সময় নাই। বপনের কিছুদিন পর থেকেই পাতলা করার সময়ে শাক বা কচি অবস্থায় উঠানো যায়। রসালো ও মোলায়েম থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত। সংগ্রহের পর পাতা কেটে ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে হয় এবং আকার অনুযায়ী বাছাই করে দু'টি বা চারটির আঁটি বেঁধে বিপণন করা উচিত। গড় ফলন হেক্টরে ৩০-৪০ টন। তবে ইউরোপীয় জাতের ফলন ১০-১৫ টনের বেশী নয়।

১.২.৫.২ গাজর

গাজর ধনিয়া পরিবারের একটি উৎকৃষ্ট মূল জাতীয় সবজি। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে এর উৎপত্তি এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল থেকে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছে। উন্নত বিশ্বে এর চাষ বেশী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে গাজর উৎপাদনের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও প্রচলন অত্যন্ত সীমিত।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ১১০-১২০ দিনের মধ্যে গাজর পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ উপযোগী হয় এবং এ সময়ে সংগ্রহ করলে, সহজে বিনষ্ট হয় না বা কুচকে যায় না। তবে ৭০-৭৫ দিন বয়স থেকেই সংগ্রহ করা চলে। কিন্তু ফলন কম হয়। গাজর অক্ষত অবস্থায় সংগ্রহ, বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে এবং পাতা কেটে পলিথিনের প্যাকেটে পুরে বা খোলা অবস্থায় বিক্রয় করতে হয়। হেক্টরে ১৫-২৫ টন গাজর ও ৩০০-৪০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৫.৩ শালগম

শালগম একটি স্বল্প মেয়াদী মূল জাতীয় সবজি। এশিয়া মহাদেশ এর উৎপত্তি স্থল। বাংলাদেশে চাষ অত্যন্ত সীমিত। শালগমের পাতা ও মূল পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ও ভক্ষণ যোগ্য। কিন্তু প্রধানত মূলের জন্য এর চাষ হয়ে থাকে। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ', 'বি', 'সি', ক্যালসিয়াম এবং লৌহ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকে এবং রোগ প্রতিরোধ ও অস্থি গঠনে সহায়তা করে। শালগম মাছ ও মাংসের সাথে বা অন্যান্য সবজীর সংমিশ্রণে রান্না করে খাওয়া যায়। ইউরোপীয় জাতের শালগম মোলায়েম বিধায় কচি অবস্থায় সালাদ হিসাবেও খাওয়া চলে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ৫০-৬০ দিনের মধ্যে শালগম সংগ্রহ উপযোগী হয় এবং মোলায়েম, সুস্বাদু ও রসালো থাকা অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত। বাংলাদেশে প্রায় ক্ষেত্রেই পরিপক্ক অবস্থায় আঁশাল ও বিস্বাদ হওয়ার পর শালগম সংগ্রহ করা হয়। এতে সবজির গুণাগুণ ও বাজার দর কমে যায়। তাই সঠিক সময়ে ফসল সংগ্রহ পূর্বক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও বাছাই করে বিপণন করা উচিত। হেক্টরে গড়ে ১৫-২৫ টন সবজি ও ৫০০-৭০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৬ ফল জাতীয় সবজি

১.২.৬.১ বেগুন

বেগুন আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় সবজি। বেগুন বারো মাস ব্যাপী জন্মে ও বাজারে পাওয়া যায়। আবাদী এলাকা ও উৎপাদনের পরিমাণের ভিত্তিতে এটা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান সবজি। ভারতীয় উপ-মহাদেশে এর উৎপত্তি স্থল। বেগুন গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল ছাড়াও ইটালী, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি শীত প্রধান অঞ্চলেও জন্মে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল ধরে এবং ৯০-১০০ দিনের মধ্যে বেগুন সংগ্রহ উপযোগী হয়। আকর্ষণীয় রং, মোলায়েম শাঁস ও বীজ অপক্ক থাকা অবস্থায় বেগুন সংগ্রহ, বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত। সযত্ন পরিচর্যায় একই জমি থেকে ৩-৪ মাস ফসল তোলা যায়। সংগৃহীত বেগুন থেকে বিকৃত, পঁচা, পোকায় খাওয়া, রোগাক্রান্ত বেগুন আলাদা করে ফেলতে হবে। এরপর ভালভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে ঠান্ডা করতে হবে। বেগুনের গা ভালভাবে মুছে পরিস্কার করে তেল মাখানো যেতে পারে। এতে করে বেগুনের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এক্ষেত্রে ভোজ্য তেল যেমন সয়াবিন, সরিষার তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। পরিচ্ছন্ন ও বাতাস চলাচল করতে পারে এমন স্থানে সাজিয়ে বেগুন সংরক্ষণ করতে হবে। জাত, যত্ন ও জমির রকম ভেদে প্রতি হেক্টরে ২৫-৫০ টন বেগুন এবং ৮০-১৫০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৬.২ টমেটো

টমেটো পৃথিবীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় সবজি। টমেটো বেগুন পরিবারভূক্ত এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের বিলাতী বেগুন নামে বেশী পরিচিত। মধ্য অ্যামেরিকার মেক্সিকোতে সম্ভবত টমেটোর উৎপত্তি স্থান। ১৬৯৫ সনের পরে ধীরে ধীরে ফ্রান্স, ইটালী হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে এটা উন্নত সবজি হিসাবে পরিচিতি লাভ করে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটা এ দেশে প্রবর্তিত হয়। এটা বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ হয়ে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: টমেটো দীর্ঘ মেয়াদী ফসল। বীজ বপনের ৭০-৮০ দিন পরে গাছে ফুল ধরে ও ১০০-১২০ দিনের মধ্যে প্রথম ফসল সংগ্রহ উপযোগী হয়। অবিরত জাতে ৫০-৬০ দিন আর

সবিরত জাতে ১৫-২০ দিন পর্যন্ত টমেটো সংগ্রহ করা যায়। পরিপক্ক ফল রং ধরার পূর্বে সংগ্রহ করলে বেশী দিন সংরক্ষণ ও দুরবর্তী বাজারে বিপণন করা সম্ভব হয়। জমি থেকে টমেটো তোলার পর খাঁচায় করে ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় পাকা টমেটো মেঝেতে খড় বিছিয়ে ঢেকে রাখতে হয়। অনেক সময় খাচায় খড় বিছিয়ে টমেটো ঢেকে রাখা যায়, স্থানীয় জাতের ক্ষেত্রে ৫-৭ সপ্তাহ পর্যন্ত রাখা যায়। হাইব্রিড জাতগুলো ২০ দিন পর্যন্ত রাখা যায়। আধুনিক প্রথায় ভরা ও নাবি মৌসুমে ৩০-৪০ টন আর অন্য মৌসুমে হেক্টরে ১০-১৫ টন টমেটো এবং ১০০-১৫০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৬.৪/৩ ঢেঁড়স

ঢেঁড়স জবা পরিবারভুক্ত জনপ্রিয় সবজি। আফ্রিকা মহাদেশে এর উৎপত্তি এবং সম্ভবত সম্রাট শেরশাহের সময়ে বাংলাদেশে এর চাষ আরম্ভ হয়। ঢেঁড়স শহরাঞ্চলে বেশী জনপ্রিয়। অনেক দেশে ঢেঁড়স ওকরা এবং ভারত ও বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ভিন্ডি বা ভেন্ডি নামে পরিচিত।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বোনার ৪০-৫০ দিনের মধ্যে গাছে ফুল আসে ও ফল ধরে এবং ৪-৫ দিন বয়সের কচি ফল সংগ্রহ করতে হয়। বেশী বয়সে ফল আঁশাল ও নিকৃষ্টমানের হয়ে যায় এবং নিয়মিত সংগ্রহ না করলে গাছে ফল ধরার প্রবণতা কমে যায়। ঢেঁড়সের ফল একদিন পর পর সংগ্রহ করা উচিত। যথারীতি পরিচর্যা করলে এবং গাছ রোগাক্রান্ত না হলে ২-৩ মাস ধরে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ধারালো ছুরি দিয়ে বোঁটা কেটে ঢেঁড়স সংগ্রহ করা এবং যথারীতি বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস পূর্বক পলিথিনের মোড়কে পুরে দ্রুত বিপণন করা উচিত। আঘাতপ্রাপ্ত ঢেঁড়স সজীবতা হারিয়ে ফেলে ও কালো হয়ে যায়। প্রতি হেক্টরে ৮-১০ টন ফল এবং ৮০০-১২০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৭ কুমড়া জাতীয় সবজি

১.২.৭.১ শসা ও খিরা

শসা ও খিরা বর্ষজীবী সবজি এবং প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে উৎপত্তি হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্ম মন্ডলীয় অঞ্চল নির্বিশেষে সারা দুনিয়ায় এগুলোর চাষ হয়ে থাকে। দুটি সবজীর মধ্যে

কিছুটা পার্থক্য থাকলেও অনেক স্থানেই এগুলো অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এদের ব্যবহার ও চাষাবাদ প্রক্রিয়া মোটামুটি একই রকম।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ৫০-৬০ দিন বয়সেই গাছে ফল ধরে ও ৫-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ উপযোগী হয়। ফলের খোসা ও বীজ শক্ত হবার পূর্বেই পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করতে হয়। অন্যথায় গুণাগুণ বিনষ্ট হয়ে যায়। একদিন পর পর ছুড়ি দিয়ে বোঁটা কেটে ফল সংগ্রহ এবং দু'এক দিনের মধ্যে বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে বিপণন করা উত্তম। হেক্টরে জাত ও মৌসুম ভেদে ১৫-২০ টন শসা এবং ১৫০-২০০ কেজি বীজ জন্মে। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪-৫ দিনের বেশী ভাল থাকে না।

১.২.৭.২ মিষ্টি কুমড়া

মিষ্টি কুমড়া বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সবজি। আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং বহুকাল পূর্ব থেকে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মত বাংলাদেশেও চাষ হয়ে আসছে। বিভিন্ন এলাকায় একে কুমড়া, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি লাউ বলে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে গাছে ফল ধরা শুরু হয় এবং চাহিদা মাফিক কচি ফল সংগ্রহ করা চলে। পাকা ফল সংগ্রহের উপযুক্ত হতে ১০০-১২০ দিন সময় লাগে। পরিপক্ক ফল বোঁটাসহ সংগ্রহ পূর্বক সংরক্ষণ এর ব্যবস্থা করা যায় এবং ভাল বাজার দরের সময়ে বিক্রি করা উচিত। হেক্টরে ২০-২৫ টন কুমড়া আর ৫০০-৬০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৭.৩ চাল কুমড়া

চাল কুমড়া ও গেমী কুমড়া মুলত একই রকমের সবজি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে এবং উষ্ণমন্ডলীয় এলাকায় চাষ হয়ে থাকে। লতানো গাছে বৃহদাকৃতির ফল ধরে যা কচি অবস্থায় সবুজ থাকে কিন্তু পরিপক্কতা লাভের সময়ে ত্বকে সাদা মোমের আবরণ পড়ে। চাল কুমড়ার গাছ বেশী লতানো, ফলবড় ও লম্বাটে, রবি ও খরিপ দু'মৌসুমেই মাচা, চালা ও ভূমিতে জন্মে। পক্ষান্তরে গেমী কুমড়ার গাছ কম লতানো, ফল কিছুটা ছোট ও গোলাকার। রবি মৌসুমে প্রধানত চরাঞ্চলে ও ভূমিতে জন্মে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপণের দু'মাস পর থেকেই ফল ধরা আরম্ভ হয়। পছন্দ মাফিক কচি বা পরিপক্ক ফল বোঁটা সহ ধাপে ধাপে সংগ্রহ করা যায়। কচি ফল সাবধানে নাড়াচাড়া করা বাঞ্চনীয়। কুমড়া পাকলে উপরিভাগে সাদা প্রলেপ পড়ে ও বোঁটা শুকিয়ে আসে। এরূপ পাকা ফল কয়েকমাস রেখে খাওয়া যায়। বোঁটার কাটা মাথায় মোম লাগিয়ে সংরক্ষণ মেয়াদ বাড়ানো যায়। হেক্টরে ১৫-২০ টন কুমড়া জন্মে।

১.২.৭.৪ লাউ

লাউ বা কদু বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় সবজি। ইহা দেশের সর্বত্র প্রধানত বসতবাড়ির আশেপাশে শীতকালে চাষ হয়ে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণ মন্ডলীয় অঞ্চলে এর উৎপত্তি হয়েছে। লাউ এর চাষ প্রণালী অত্যন্ত সহজ এবং আগাম চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের দু'মাস পরে গাছে ফল ধরে এবং ফল ধরার ১০-১২ দিনের মধ্যে ফলের খোসা ও বীজ শক্ত হওয়ার পূর্বে বোঁটা কেটে ফল সংগ্রহ করা উচিত। হেক্টরে ২৫-৩০ টন লাউ ও ১৫০-২০০ কেজি বীজ জন্মে। লাউ সতর্কতার সঙ্গে পরিবহন ও দ্রুত বিপণনের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়।

১.২.৭.৫ উচ্ছে ও করলা

উচ্ছে ও করলা দু'টি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ কুমড়া জাতীয় উষ্ণমন্ডলীয় সবজি। সবজি দু'টি বর্ষজীবী, নিরপেক্ষ ও লতানো প্রকৃতির এবং চীন, ভারত ও বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকায় চাষ হয়ে থাকে। উচ্ছে আকারে অত্যন্ত ছোট, প্রায় গোলাকার বা ডিম্বাকৃতির, ৪-৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও সবুজ আর করলা আকারে বড়, ১০-২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও সবুজ বা ধুসর বর্ণের হয়ে থাকে। কিউকার বিটাসিন নামক দ্রব্যের উপস্থিতির কারণে ফল তিতা হয়ে থাকে। উচ্ছের তিক্ততা অপেক্ষাকৃত বেশী। আর্দ্র পরিবেশে উচ্ছে করলার ন্যায় ভাল জন্মে না।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পর থেকে গাছে ফল ধরা আরম্ভ করে ও মাস দু'য়েক অব্যাহত থাকে। কচি অবস্থায় বীজ শক্ত হওয়ার পূর্বেই জমি থেকে এক দিন পর পর ফল সংগ্রহ করা এবং সংগ্রহের ২-৩ দিনের মধ্যে বিপণন করা উচিত। হেক্টরে ৫-৭ টন উচ্ছে ও করলা এবং ২০০-২৫০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.৭.৬ কাকরোল

কাকরোল একটি জনপ্রিয় দেশীয় সবজি। কাকরোল গাছ দীর্ঘজীবী ও ডায়োসিয়াস প্রকৃতির। বাংলাদেশসহ ভারত ও শ্রীলংকায় সীমিত পরিমাণ জন্মে। এর ফল পুরাপুরি পরিপক্কতার লাভের পূর্বে তরকারী, ভাজি বা ভাতে সিদ্ধ দিয়ে ভর্তা করে খাওয়া হয়। এতে শর্করা, আমিষ, ক্যারোটিন, ক্যালসিয়াম এবং অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ লবন যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। এটা খেতে অত্যন্ত উপাদেয়। কিন্তু সীমিত পরিমাণে জন্মে বিধায় বাজারে বেশী দামে বিক্রি হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: কন্দ মূল থেকে চারা গজানোর দু'মাসের মধ্যে অর্থাৎ মধ্য জৈষ্ঠ্য থেকে ভাদ্র পর্যন্ত গাছে ফল ধরে। পরিপক্কতা লাভের পূর্বে সবুজ অবস্থায় কাকরোল সংগ্রহ পূর্বক ২-৩ দিনের মধ্যে বিপণন করতে হয়। হেক্টরে ১০-১৫ টন কাকরোল জন্মে। দ্বিতীয় বছরে ফলন কিছুটা বাড়ে।

১.২.৭.৭ পটল

পটল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গ্রীষ্মকালীন সবজি। আসাম ও বাংলাদেশে এর উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে এদেশের রাজশাহী, বগুড়া ও যশোর অঞ্চলে অধিক চাষ হয়। পটলের গাছ দীর্ঘজীবী, লতানো ও ডায়োসিয়াস প্রকৃতির এবং মাঠে চাষ করা যায়। এর ফল ১০-১২ সেন্টিমিটার লম্বা, মাথা চোখা, ধূসর ও সবুজ বর্ণের ডোরা কাটা বা ডোরা বিহীন হয়ে থাকে। পটল উপাদেয়, সহজ পাচ্য ও পুষ্টিকর সবজি। এটা মুত্র বর্দ্ধক, কোষ্ঠ পরিস্কারক ও উত্তেজক এবং হৃদযন্ত্র ও মস্তিস্ক সক্রিয় রাখতে ও রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে। পটল তরকারী ও ভাজি হিসাবে অথবা দোলমা করে খাওয়া যায়। এর পাতা বড়া, স্যুপ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: রোপনের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ফেকড়ি বের হয় ও তিন মাস পর গাছে ফল ধরে। ফল কচি অবস্থায় অর্থাৎ বীচি শক্ত হবার পূর্বে সংগ্রহ করতে হয়। একদিন পর পর পটল সংগ্রহ করা উচিত। হেক্টরে ১৫-২০ টন পটল জন্মে।

১.২.৭.৮ চিচিংগা

চিচিংগা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রীষ্মকালীন সবজি। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এর উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্র গৃহস্থালীতে আর ঢাকার আশেপাশে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর চাষ হয়ে থাকে। এটা বর্ষজীবী, লতানো ও মনোসিয়াস প্রকৃতির উদ্ভিদ। এর কান্ড সরু ও কোমল, পাতা হালকা সবুজ ও খন্ডিত, ফুল সাদা ও ক্ষুদ্রাকার এবং ফল দন্ডাকার, মাথা সূঁচালো, জাতভেদে হালকা সবুজ থেকে নীলাভ সবুজ, ২০-১৫০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ডোরাকাটা হয়ে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: চিচিংগার গাছ দ্রুত বর্ধনশীল এবং বপনের দু'মাসের মধ্যে ফল ধারণ করে। শাঁস কচি অবস্থায় চিচিংগা সংগ্রহ করতে হয়। প্রায় দেড় মাস ব্যাপী ফল ধরা ও সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। হেক্টরে ১৫-২০ টন সবজি ও ২০০-৩০০ কেজি বীজ জন্মে। সংগ্রহের দু'দিনের মধ্যে বিপণন ও ব্যবহার না করলে কচি চিচিংগা সজীবতা হারিয়ে ফেলে এবং বয়স্ক চিচিংগা পেঁকে পঁচে যায়।

১.২.৭.৯ ঝিংগা ও ধুন্দুল

ঝিংগা ও ধুন্দুল দু'টি সমগোত্রীয় লতানো প্রকৃতির ও দিবাদীর্ঘ নিরপেক্ষ গ্রীষ্মকালীন সবজি। ভারতীয় উপমহাদেশে এদের উৎপত্তি হয়েছে। ঝিংগা ভারত ও বাংলাদেশে সবজি হিসাবে চাষ হলেও পশ্চিমা দেশে তেমন পরিচিত নয়। পরিপক্ক ধুন্দুলের শুষ্ক আঁশ গোছল ও তৈজসপত্র পরিস্কারের কাজে ব্যবহৃত হয় বলে ইউরোপ ও আমেরিকায় এর যথেষ্ট চাষ হয়। এটা এদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুনো অবস্থায় জন্মে। প্রায় সব জাতেই পুরুষ ও স্ত্রী ফুল একই গাছে পৃথক পৃথক জন্মে ও হলুদ বর্ণের হয়। ধুন্দুলের গাছ ঝিংগার চেয়ে দীর্ঘ প্রসারী এবং ফল বেলনাকার ও শিরাবিহীন। পক্ষান্তরে ঝিংগার ফল শিরাযুক্ত এবং জাতভেদে লম্বা ও খাটো হয়ে থাকে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : বীজ বপনের দু'মাসের মধ্যে গাছে ফল ধরে ও ২-৩ মাস ব্যাপী ফল ধরা ও সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। হেক্টরে ১০-১২ টন সবজি ও ৩০০-৪০০ কেজি বীজ জন্মে। আঁশাল হওয়ার পূর্বে ফল সংগ্রহ করতে হয় ও ২-৩ দিনের মধ্যে ব্যবহার না করলে গুণাগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১.২.৮ সীম জাতীয় সবজি

১.২.৮.১ সীম

দেশী সীম বাঙ্গালির অতিপ্রিয় সবজি। সীম জাতীয় সবজির মধ্যে এদেশে এটা সর্বাধিক জন্মে। এর চাষাবাদ প্রণালী অতি সহজ। দেশের সর্বত্রই বসতবাড়ীর আশেপাশে বা ঘরের চালে দু'চার ঝাড় সীম পারিবারিক চাহিদা পুরণের জন্য চাষ করা হয়। কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ও আধুনিক প্রথায় এর চাষ অত্যন্ত সীমিত। এ উপ-মহাদেশে বা আফ্রিকায় এর উৎপত্তি হয়েছে এবং প্রধানত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মিশর ও সুদানে প্রাচীন কাল থেকে চাষ করা হচ্ছে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : সীম ফসল ধাপে ধাপে সংগ্রহ পূর্বক বিপণন করতে হয়। ফসলের আগামত্ব জাতের বৈশিষ্টের উপর নির্ভরশীল। জাতভেদে কার্তিক থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সীম সংগ্রহ করা চলে। হেক্টরে ৭-১০ টন সীম জন্মে।

১.২.৮.২ বরবটি

বরবটি একটি উৎকৃষ্ট সীম জাতীয় সবজি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এর উৎপত্তি হয়েছে। বাংলাদেশে এর আবাদ ও উৎপাদন খুবই কম। এর আবাদ বৃদ্ধি করে বর্ষাকালীন সবজির ঘাটতি পূরণ ও রপ্তানী বাড়ানোর উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : বীজ বপনের ৫০-৬০ দিন পরে বরবটিতে ফুল ও ফল ধরে এবং ফল ধরার ৪-৫ দিনের মধ্যে কচি শুটি বোঁটাসহ কেটে সংগ্রহ করতে হয়। বয়স্ক শুটি আঁশাল ও নিকৃষ্ট মানের হয়ে যায়। ফলে প্রতিদিন শুটি সংগ্রহ এবং বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে আঁটি বেঁধে পলিথিন মোড়কে পুড়ে বিক্রয় করা উচিত। উন্নত জাতের বরবটি হেক্টরে ১০-১২ টন এবং বীজ ৬০০-৮০০ কেজি জন্মে।

১.২.৯ কন্দাল জাতীয় সবজি

১.২.৯.১ আলু

আলু *Solanaceae* বেগুন পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কন্দাল জাতীয় অর্থকরী সবজি। বহু বছর পূর্বে আমেরিকায় এর উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশে চাষ হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে বছরে ৩০ কোটি টন ও বাংলাদেশে ১৩ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়। মোট খাদ্যশষ্য উৎপাদনের বিবেচনায় বাংলাদেশে ধান ও গমের পরই আলুর স্থান এবং এদেশে এর উৎপাদন কয়েক গুন বাড়ানোর সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

ফসল সংগ্রহ : বীজ রোপনের ১০০-১২০ দিন পর আলু সংগ্রহ উপযোগী হয় এবং ঐ সময়ে পাতা লাল হয়ে আস্তে আস্তে গাছ মরে যায় ও আলুর চামড়া পুরু হয়। শুষ্ক পরিবেশে কোদাল বা লাঙ্গলের সাহায্যে সারির মাটি সরিয়ে অক্ষত অবস্থায় আলু সংগ্রহ করতে হয়। পরে কাটা, রোগা ও পোকা খাওয়া আলু বাছাই করে ছায়াময়, শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ু চলাচল উপযোগী স্থানে এক সপ্তাহ শুকিয়ে নিতে হয়। শুকানো শেষ হলে যথারীতি বাছাই ও শ্রেণীবিন্যাস পূর্বক পাতলা চটের বস্তায় ভর্তি করে বিপণন বা সংরক্ষণ করা উত্তম। পানি বা শিশির ভেজা অবস্থায় মাঠ থেকে আলু উঠানো এবং সংগ্রহের পরে রোদে বা বস্তা বন্দী করে রাখা উচিত নয়। আগাম ফসল পুরাপুরি পরিপক্ক হবার আগেই সংগ্রহ করা চলে। হেক্টরে উন্নত জাতের আলু ২০-২৫ টন ও দেশী জাতের আলু ১০-১২ টন জন্মে এবং ৪০-৪৫ টন ফলনের নজিরও বাংলাদেশে পাওয়া যায়।

কৃষক পর্যায়ে সংরক্ষণ : আলু রোপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে আলু তোলার উপযুক্ত সময়। উন্নত জাতের আলু ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। আলু গাছ ধূসর হয়ে মরে গেলে তখন আলু সংগ্রহের উপযুক্ত সময় তবে আলু তোলার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এতে ঘরেই ৫-৬ মাস ভালভাবে আলু সংরক্ষণ করা যায়। এ বিষয়গুলো হলো- মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে আলু তোলা ঠিক না। সকালের সময়ে আলু উঠানো ভাল। আলু সম্পূর্ণভাবে পরিপক্ক হলে তুলতে হয়। আলু উঠানোর ৭-১০ দিন আগে গাছের গোড়া কেটে ফেলা দরকার। আলু তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোদাল বা লাঙ্গলের আঘাতে আলু কেটে না যায়। আলু তোলা শেষ হলে তা পরিবহণের সময় চটের বস্তা ব্যবহার করা ভাল। সাধারণত বস্তায় আলু ভরার সময় প্লাষ্টিকের ঝুড়ি বা গামলা ব্যবহার করা উত্তম। আলু সংগ্রহ শেষে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে নেয়া দরকার। যদি কোন কারণে ক্ষেতে আলু রাখতে হয় তা হলে ছায়াযুক্ত জায়গায় রেখে পাতলা কাপড় বা খড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বাড়িতে আলু পরিস্কার, শুকনো ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হয়। আলু সংগ্রহ করা শেষ হলে ১-৭ দিন পরিস্কার ঠান্ডা জায়গায় বিছিয়ে রেখে পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে কিউরিং করলে আলুর গায়ের ক্ষত সেরে যাবে ও সংরক্ষণের আগে কাটা, ফাটা, সবুজ, রোগাক্রান্ত আলু বাছাই করতে হয়। সংগ্রহের ৭-১০ দিনের ভেতর আলু পরিস্কার করে আকার অনুযায়ী (বড়, মাঝারি, ছোট) গ্রেডিং করতে হবে। বাছাই করা আলু ঠান্ডা বাতাসযুক্ত ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়। সংরক্ষণ

করার জন্য সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না এমন বড় গাছের নীচে বাঁশের বেড়া ও ছনের চালা দিয়ে ঘর তৈরী করে ভিতরে একাধিক স্তর বাঁশের মাচা তৈরী করে তার উপর আলু সংরক্ষণ করলে ৪-৬ মাস পর্যন্ত আলো ভাল থাকে। ঘরটির ভিতর উপর-নীচে প্রচুর বাতাস চলাচলের সু-ব্যবস্থা থাকতে হবে। আনুমানিক ১৫০-২০০ মন আলু ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারী আয়তনের সংরক্ষণাগারের জন্য প্রথমত ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ হবে। যেখানে জুন-জুলাই পর্যন্ত খুব কম পরিমান অপচয় করে হিমাগারে সংরক্ষণের বাড়তি ঝামেলা ছাড়া অনায়াসেই আলু সংরক্ষণ করে কৃষকগণ অধিক মুনাফা পেতে পারেন। মার্চ হতে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিমাগারে অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে আলু সংরক্ষণ না করে দেশীয় প্রযুক্তিতে বসতবাড়ীতে খাবার আলু হিসাবে অনায়াসেই জুলাই পর্যন্ত রাখা যায়। এতে ১০%-১৫% ওজন হ্রাস হওয়ার পরও অধিক মুনাফা হবে। অতএব, কৃষকদের অধিক উৎপাদিত আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগারের উপর নির্ভরশীল না হয়ে দেশীয় প্রযুক্তিতে বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণ করা উচিত। সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে মেঝেতে বিছিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া বাঁশের তৈরী মাচায়, ঘরের তাকে বা চৌকির নিচে ও আলু বিছিয়ে রাখা যায়। সংরক্ষিত আলু ১০-১৫ দিন পর নিয়মিত বাছাই করা দরকার। রোগাক্রান্ত, পোকা লাগা ও পঁচা আলু দেখা মাত্র ফেলে দিতে হবে। আলুতে সুতলি পোকা দেখা গেলে সাথে সাথে বাছাই করে অনেক দূরে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

চিত্র : কৃষক পর্যায়ের আলু সংরক্ষণাগার

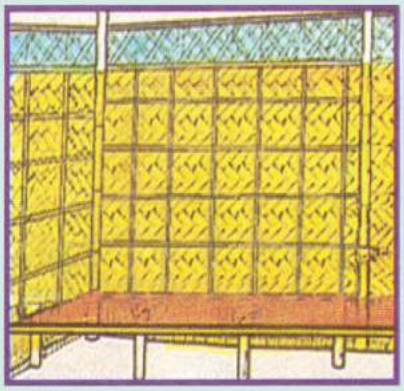

চিত্র : সংরক্ষণাগারের ভিতরের অংশ;

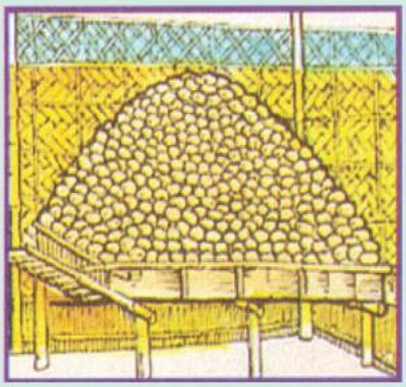

চিত্র : সংরক্ষিত আলু

হিমাগারে (Cold storage) আলু সংরক্ষণ:

আলু সংরক্ষণের জন্য হিমাগার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান। বীজ আলু অবশ্যই হিমাগারে রাখতে হবে। হিমকক্ষে নেয়ার আগে আলু ২৪-৪৮ ঘন্টা ১৫-১৮ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় প্রিকুলিং চেম্বারে রাখতে

হবে। এরপর হিমকক্ষে নিয়ে র‍্যাকের উপর বস্তা সারি করে রেখে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমিয়ে ২.৮-৩.৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। এ সময় আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫-৯০% বজায় রাখতে হবে। সংরক্ষণের সময় ২/৩ বার বস্তা উল্টিয়ে দিলে আলু ভাল থাকে এবং অঙ্কুরিত হয় না। হিমকক্ষে অন্তত একবার মুক্ত বাতাস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

১.২.৯.২ মিষ্টি আলু

মিষ্টি আলু একটি কন্দ জাতীয় সবজি। এটি দীর্ঘজীবী ও লতানো উদ্ভিদ। এর লতা মাটিতে গড়িয়ে চলে ও অল্প যত্নে অধিক ফলন দেয়। এর উৎপত্তি স্থল আমেরিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় এবং সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে চাষ শুরু হয়েছে। শীত ও গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চল এবং উন্নত ও অনুন্নত অধিকাংশ দেশেই এর চাষ হচ্ছে এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবির্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রধানত নদী, সৈকতে ও চর এলাকায় চাষ হয় এবং অজ্ঞতাবশত অনেকেই একে গরীবের খাদ্য হিসাবে গণ্য করেন।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: মিষ্টি আলু লাগানোর ৫ মাস পরে অর্থাৎ মার্চ থেকে মে মাসে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। আলু পরিপক্ক হলে গাছের পাতা কিছুটা বিবর্ণ ও হলদে হয়। পুষ্ট আলু চাপ দিলে সহজেই ভেংগে যায় ও তাড়াতাড়ি শুকায়। অপক্ক আলু তোলা উচিত নয়। সংগ্রহের অন্যান্য নিয়ম, সংরক্ষণ ও বিপণন গোল আলুর অনুরুপ। হেক্টরে ১০-১৫ টন আলু জন্মে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে ৪০-৪৫ টন জন্মানো সম্ভব।

১.২.১০ শাক জাতীয় সবজি

১.২.১০.১ পুঁইশাক

পুঁই কোমল কান্ড ও পত্র লতানো প্রকৃতির দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। ইহা বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় এবং বর্ষজীবী ফসল হিসাবে চাষ হয়ে থাকে। অতি প্রাচীন কাল থেকেই এটি ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রচলিত আছে। পুঁই অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'এ' ও ক্যালসিয়াম এবং সীমিত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ লবন বিদ্যমান থাকে। এর পাতা, কচি ডগা, অপক্ক

ফল, ফুল ইত্যাদি শাক ও তরকারী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইলশে পুঁই খেতে খুবই মুখরোচক।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: চারা গজানোর ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই মাঠে ফসলের ২০-২৫ সে.মি. লম্বা ডগা পাতাসহ গোড়ার কিছুটা উপরে কেটে সংগ্রহ করা চলে। ডগা সংগ্রহের পর পুনঃ পুনঃ গোড়া থেকে শাখা প্রশাখা বের হয় যা ৫-৬ টি পাতা ধারণ করলে পুনরায় সংগ্রহ করা যায়। মাচার ফসল বিলম্বে সংগ্রহ উপযোগী হয় ও বাউনীতে লতানোর পূর্বে সংগ্রহ করা যায় না। ডগা আঁশাল হওয়ার পূর্বে রসাল অবস্থায় সংগ্রহ করা ও বাছাই পূর্বক মোটা বেঁধে বিপণন করা উচিত। যথারীতি পরিচর্যা করলে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত গাছের শাখা প্রশাখা বিস্তার ও ফসল সংগ্রহ অব্যাহত থাকে। হেক্টরে ৫০-৬০ টন পুঁই এবং ৩০০-৫০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.১০.২ ডাঁটা শাক

ডাঁটা একটি কোমলাঙ্গী বর্ষজীবী ও বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সবজি। ভারতীয় উপ-মহাদেশে এর উৎপত্তি। এদেশের প্রত্যেক কৃষক পরিবারেই খরিপ মৌসুমে এর চাষ হয় ও সবজির ঘাটতি পূরনে যথেষ্ট অবদান রাখে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ গজানোর ১০-১৫ দিন পর চারা পাতলা করার সময় থেকে ফসল সংগ্রহ আরম্ভ হয় ও উঠানো চারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বাছাই করে আঁটি বেঁধে বিক্রয় করা হয়। এভাবে মাঠের ফসল শেষ হওয়া পর্যন্ত সংগ্রহ ও বিপণন অব্যাহত থাকে। বয়স্ক গাছ কাস্তের সাহায্যে মাটির সমতলে কেটে সংগ্রহ করতে হয়। পুনঃ পুনঃ সংগ্রহ যোগ্য গাছ কান্ডের কিয়দাংশ রেখে সংগ্রহ করা উচিত। হেক্টরে সংগ্রহের পর্যায় ভেদে ২৫-৩০ টন ডাঁটা ও ৪০০-৫০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.১০.৩ লাল শাক

লাল শাক ডাঁটা পরিবারে একটি বর্ষজীবী কোমলাঙ্গী উদ্ভিদ। সমগোত্রীয় বিধায় গাছের দৈহিক গঠন ডাঁটার প্রায় অনুরূপ। তবে গাছ খাটো একহারা। কান্ড ফাঁপা ও নরম। পাতা ও কান্ড ভাজি করে খাওয়া যায়। "এনথোসায়ানিন" নামক এক ধরনের রঞ্জকের উপস্থিতির জন্য এর কান্ড ও পাতা সব সময় উজ্জল লাল বর্ণের হয় এবং রান্নার পরও তরকারী লাল বর্ণ ধারন করে। এটা বারো মাস জন্মানো

যায়। রবি মৌসুমে ভাল জন্মে। এটা স্বল্প মেয়াদি ফসল। বপনের ৩০-৪০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। লাল শাক অত্যন্ত মুখরোচক ও ডাঁটার চেয়ে অধিক খাদ্যমান সমৃদ্ধ। উৎপাদন পদ্ধতি, বীজ হার, সারের মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি ডাঁটার অনুরূপ। হেক্টরে ৫-৭ টন শাক ও ৩০০-৪০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.১০.৪ গিমা কলমী (ক্যাংকন)

গিমা কলমী বাংলাদেশের খালবিল ও জলাশয়ের জন্মানো লতানো প্রকৃতির নিকৃষ্ট মানের কলমী নয়। এটা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভূমিতে আবাদযোগ্য ঝোপালো প্রকৃতির কলমী। এসব অঞ্চলে ক্যাংকন নামে পরিচিত ও ব্যপক ভাবে চাষ হয়। ১৯৮৩ সনে বাছাই পূর্বক বাংলাদেশের প্রবর্তনের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। গিমা কলমী পুষ্টিমানে সমৃদ্ধ, নরম ও সুস্বাদু। এতে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ, শর্করা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। যা সহজেই সিদ্ধ হয় ও শাক হিসাবে খাওয়া যায়।

ফলন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজ বপনের এক মাস পর প্রথম ফসল সংগ্রহ করা হয়। কাস্তের সাহায্যে ভুমি থেকে ৫-১০ সে.মি. উপরে ফসলের গোড়া কাটলে, গোড়া থেকে পুনঃ পুনঃ ডগা জন্মায় ও ৩ সপ্তাহ পর পর ৫-৬ বার সংগ্রহ করা যায়। এটা কচি ও নরম বিধায় মোটা বেঁধে তাড়াতাড়ি বিক্রয় করতে হয়। হেক্টরে ৪০-৫০ টন শাক এবং প্রায় দেড়টন বীজ জন্মে।

১.২.১০.৫ পালং শাক

পালং শাক বলতে মিষ্টি ও টক পালং উভয় প্রজাতিকেই বুঝায়। এটা একটি পত্র বহুল সবজি এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া এর উৎপত্তিস্থল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষত শীত প্রধান অঞ্চলে এটা ব্যপক ভাবে চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে উভয় প্রজাতির পালং শাক বেশ জনপ্রিয়। মিষ্টি পালং chenopodiaceae এবং টক পালন polygonaceae পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পরে পালং সংগ্রহ উপযোগী হয়। পাতলা করার সময়ে উঠানো চারাও খাওয়া যায়। কাস্তের সাহায্যে গোড়া কেটে পালং সংগ্রহ পূর্বক বাছাই ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আঁটি বেঁধে বিক্রয় করতে হয়। গোড়া থেকে ২-৩ সে.মি. উপরে ফসল কাটলে পুনরায় কুশি গজায় ও একই জমি থেকে ৩-৪ বার ফসল সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরে ১৫-২০ টন শাক ও ৫০০-৭০০ কেজি বীজ জন্মে।

১.২.১০.৬ পাট শাক

পাট আঁশ জাতীয় ফসল হলেও এর পাতা সারা দেশেই কম বেশী ব্যবহৃত হয়। কেবল মাত্র দেশী জাতের পাট পাতা শাক হিসাবে খাওয়া যায়। পাট শাক তিক্ত স্বাদের হওয়ায় কৃমি ও কুষ্ঠ নাশক এবং রক্ত পিত্ত রোগে উপকারী বলে জানা যায়। চাষ ও মই দিয়ে জমি পরিপাটি করে বীজ সারিতে ছিটিয়ে বুনতে হয় এবং ১৫ সে.মি. লম্বা হলেই গাছ থেকে কোমল পাতা সংগ্রহ করে খাওয়া চলে। বারো মাসই এর চাষ করা যায়। তবে অতি শীতে বীজ গজায় না ও শুস্ক মৌসুমে গাছ ও পাতা কোমল ও আকর্ষনীয় থাকে না।

১.২.১১ মসলা জাতীয় ফসল

১.২.১১.১ পেঁয়াজ

পেঁয়াজ একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিবর্ষজীবী শল্ক জাতীয় ফসল। পশ্চিম এশিয়া আদি জন্ম স্থান। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে এর চাষ আরম্ভ হয়েছে এবং পবিত্র কোরান ও বাইবেলে পেঁয়াজের উল্লেখ আছে। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই এর চাষ হয় এবং শল্ক কন্দ জাতীয় ফসলের মধ্যে এটা শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে। বাংলাদেশে পেঁয়াজ একটি মূল্যবান অর্থকরী ফসল।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন: ফসল পুরোপুরি পরিপক্কতা লাভের পর সংগ্রহ করা উচিত। অন্যথায় সংরক্ষণ ক্ষমতা কম থাকে ও তাড়াতাড়ি পঁচে যায়। আগাম ফসল সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পুরাপুরি পরিপক্কতা লাভের পূর্বেও সংগ্রহ করা চলে। শল্ক কন্দের গলা শুকিয়ে পাতা হেলে পড়লে পেঁয়াজ পরিপক্কতা লাভ করেছে এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ উপযোগী হয়েছে বলা চলে। বৃষ্টি বাদলে ক্ষয়ক্ষতির ভয় থাকলে ২৫% পেঁয়াজ পরিপক্ক হলেই ফসল সংগ্রহ করা যেতে পারে। হাল্কা চটের বস্তায় ভরে পরিবহন ও বিপণন করতে হয়। পেঁয়াজ সংগ্রহের পর পাতা কেটে ৫-১০ দিন বায়ু চলাচল সুবিধাযুক্ত, শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে যথারীতি বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে শুষ্ক, ঠান্ডা ও বায়ুময় গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়। উঁচু গাদা করে বা সরাসরি মেঝের উপরে সংরক্ষণ করা অনুচিত। পাতলা বুনটের চটের বস্তায় ভরে সারি বদ্ধ ভাবে মাচায় ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা উত্তম। মাঝে মাঝে পঁচা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হয়। ঠান্ডা গুদামে শূণ্য ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৬৪% আর্দ্রতায় এটা সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টরে দেশী পেঁয়াজ ১০-১৫ টন ও বিদেশী বড় পেঁয়াজ ২০-২৫ টন এবং বীজ ৫০০-৮০০ কেজি জন্মে।

১.২.১১.২ রসুন

রসুন একটি শল্ক কন্দ জাতীয় অর্থকরী ফসল। মধ্য এশিয়া এর উৎপত্তি স্থান এবং পূর্ব এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বেশী জন্মে। কিন্তু আফ্রিকায় এটা তেমন প্রচলিত নয়। বাংলাদেশের সর্বত্রই সীমিত পরিমাণে এর চাষ হয়।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন: পেঁয়াজের মত পাতার বোঁটা শুকিয়ে হেলে পড়লে চৈত্র-বৈশাখ মাসে রসুন সংগ্রহ করে পেঁয়াজের ন্যায় সংরক্ষণ ও বিপণন করতে হয়। রসুন সংগ্রহের পর ছায়াতে শুকাতে পারলে ভাল গুণাগুণ বজায় থাকে। রোদে শুকালে রসুন নরম হয়ে যেতে পারে। সুতলি পোকার লার্ভা থেকে রক্ষা পেতে হলে সংরক্ষণের সময় সেভিন পাউডার ১০ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম করে স্প্রে করে দিতে হবে। রসুন সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন ছায়াযুক্ত স্থানে শুকাতে হয়। একে রসুনের কিউরিং বলে। বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে এগুলো ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এক ঝোপা থেকে অন্য ঝোপা কিছুটা দূরে/ফাঁকা করে রাখতে হবে যাতে করে বাতাস চলাচল করতে পারে। এছাড়া রসুন উঠানোর পর পাতা ও শিকড় কেটে ব্যাগে এবং বাঁশের র‍্যাক, মাচায় এবং চটের বস্তাতেও সংরক্ষণ করা যায়। হেক্টরে ১০-১৫ টন রসুন জন্মে।

১.২.১১.৩ মরিচ

মরিচ বেগুন পরিবারভুক্ত সবজি। বাংলাদেশে প্রধানত মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হলেও উন্নত বিশ্বে সবজি হিসাবেই বেশী সমাদৃত। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল বা পেরু মরিচের উৎপত্তিস্থল। বহু পূর্ব থেকে এদেশে ঝাল মরিচ ব্যাপক ভাবে চাষ হচ্ছে। কিন্তু মিষ্টি মরিচ এখনো কৃষক পর্যায়ে প্রবর্তিত হয়নি। তবে সাম্প্রতিক কালে ঢাকার আশেপাশে এর আবাদ কিছুটা শুরু হয়েছে।

ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন: চারা রোপনের ৩০-৪৫ দিন পরে গাছে ফুল ধরে এবং ৫০-৬০ দিন পর পর থেকে ধাপে ধাপে মরিচ সংগ্রহ করা যায়। কাঁচা মরিচ ও মিষ্টি মরিচ ফল পাকার পূর্বে বীজ অর্ধপুষ্ট হলে এবং শুকানো মরিচ ফল পেকে লাল হওয়ার পর সংগ্রহ করতে হয়। পরে কাঁচা মরিচ যথারীতি বাছাই ও শ্রেণী বিন্যাস করে আর পাকা মরিচ রৌদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ বা বিক্রয় করা বাঞ্ছনীয়। মরিচ সাধারণত অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা, ছায়াযুক্ত এবং শুকনো জায়গায় ২৮ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা ও ৬০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১ থেকে ২ সপ্তাহ রাখলে মরিচের কোন ক্ষতি হয় না। সংগ্রহের পর বাছাই করে শুধু ভালগুলো সংরক্ষণের জন্য রাখতে হবে। সূর্যের আলোর সাহায্যে মরিচ শুকিয়ে সংরক্ষণ আমাদের দেশে একটি প্রচলিত পদ্ধতি। কিন্তু একটু খেয়াল না করলে বেশি সূর্যের তাপে মরিচ সাদাটে রং ধারণ করে। সংগ্রহকৃত ফসলে বৃষ্টি বা শিশির পড়লে 'পঁচা' রোগ দেখা

দেয়। মরিচ শুকানোর সময় মরিচের বোটা যেন খুলে না যায় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। মরিচ ৬৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার গরম পানির মধ্যে ৩ মিনিট রাখলে শুকানোর সময়টা কমে যায় ফলে মরিচের রং ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং মরিচ সংগ্রহের পরে ক্ষতি কম হয়। মরিচ শুকানোর পর মাচার উপরে টিনের ডোল, গোলা, বেড়ি, পলিথিন বা ড্রামে রাখতে হবে। মরিচের গোলা এমন হওয়া উচিৎ যেন বাইরে থেকে বাতাস ঢুকতে না পারে। যেসব ঘরের উপর ছায়া পড়ে এবং স্যাঁতসেতে জায়গায় অবস্থিত তেমন ঘরে মরিচ সংরক্ষণ করা যাবে না। প্রতি ৪ কেজি মরিচে এক কেজি শুকনা মরিচ এবং প্রতি কেজি শুকনা মরিচে জাতভেদে ১৫০-২৫০ গ্রাম ও হেক্টরে ৮০-১০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। তাছাড়া হেক্টরে গড়ে ৬-১০ টন কাঁচা (১.৫-২.৫ টন শুকনা) মরিচ ও ২-৩ টন মিষ্টি মরিচ জন্মে।

১.২.১১.৪ ধনিয়া

ধনিয়া এদেশের বহুল প্রচলিত পাতা জাতীয় সবজি এবং এর বীজ উত্তম মসলা। ধনিয়া পাতা বিভিন্ন রকমের তরকারী, সালাদ, স্যুপ, পিঠা, চাটনী ইত্যাদির স্বাদ ও সুগন্ধ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হয়। ভাদ্র থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত দফায় দফায় বীজ বুনে এর চাষ করা চলে। দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটি ধনিয়া চাষের জন্য উত্তম। প্রতি হেক্টরে ১০-১৫ কেজি বীজ বুনতে হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ পাকে। বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর থেকেই পাতা খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ পাকে ও পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করা যায়। পাতা খাওয়া গাছে বীজ ভাল জন্মে না।

১.২.১১.৫ মেথি

মেথি পাতা জাতীয় সবজি। পূর্ব ইউরোপ ও ইথিওপিয়ায় এর উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চল রবি মৌসুমে সামান্য পরিমাণে চাষ হয়। এর বীজ মসলা ও ঔষধ হিসাবে আর কচি ডগা ও পাতা কাঁচা ও বিশুষ্ক অবস্থায় বিভিন্ন খাবার সুগন্ধি করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন **'এ', 'বি'** ও **'লৌহ'** বিদ্যমান থাকে। মেথি দো-আঁশ ও এটেল দো-আঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। মাটি ঝুরঝুরে ও পরিপাটি করে কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে বেডের উপরে ছিটিয়ে বীজ বুনতে হয়। হেক্টরে ১৫-২০ কেজি বীজ লাগে। প্রচুর গোবর/কম্পোস্ট প্রয়োগ করে বীজ বুনা উত্তম। বীজ বপনের দেড় মাস পর মাটির ২-৩ সে.মি. উপরে গোড়া কেটে মেথির কান্ড ও পাতা সংগ্রহ করা যায়। ১ম কিস্তি পাতা সংগ্রহের পর গোড়া থেকে পুনরায় কুশি গজায়। ঐ সময়ে হেক্টরে ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করলে গাছের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় ও ফলন বাড়ে। তবে কান্ড ও পাতা কাটা গাছে বীজ ভাল জন্মে না। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ সংগ্রহ উপযোগী হয়। হেক্টরে ৪০০-৫০০ কেজি বীজ ও ৭-১০ টন কাঁচা পাতা জন্মে।

১.২.১১.৬ আদা

আদা এমন একটি মসলা যা অনেকদিন ধরে রাখা যায় না। এর জলীয় অংশ বাষ্পাকারে, বেরিয়ে যাওয়া ও শ্বসন ক্রিয়ার মাত্রা কমানোর জন্য ক্ষেত থেকে তোলার পর একে ঠান্ডা করতে হবে ও শীতল কক্ষে রাখতে হবে, তবে ঐ কক্ষের তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রী সে. এর নিচে হওয়া উচিত নয়। অল্প সময়ের জন্য রাখতে হলে কক্ষের স্বাভাবিক তাপমাত্রাই সাধারণত রাখা হয়। দ্রুত বাজারজাত করার জন্য পাঠাতে হলে পণ্য ৬৫-৭০% বাতাসের আর্দ্রতায় রাখতে হবে। বাতাস এর চেয়ে বেশি ভেজা হলে পণ্যে ছত্রাকের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে বাতাসের এ আর্দ্রতায় রাখলে পণ্যের কিছু ওজন কমে যাবে।

আদায় ইথিলিনের উৎপাদন কম হয় ও এর প্রভাবও আদায় খুব কম।

আদা কনটেইনারে করে অথবা বাক্সে ভর্তি করে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো হয়।

বাংলাদেশের সর্বত্রই আদার যথেষ্ট ব্যবহার হয়। বিদেশে বিশেষ করে ইউরোপের বাজারে আদার ব্যবহার সাধারণত দু' ধরনের:

- ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এক শ্রেণীর জনগোষ্ঠী খাদ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আদা ব্যবহার করে।
- আর এক শ্রেণী, আদা ব্যবহার করে শুধুমাত্র খাদ্যে একটা বিশেষ ধরনের গন্ধের জন্য।

আদার কোন আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ আজও হয়নি।

প্যাকেজ ও তার মানের চাহিদা

আদার প্যাকেজ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্যাকেজে রাখা পণ্যে বাতাস চলাচল করা সম্ভব হয়।

চাহিদার তারতম্যের ওপর নির্ভর করে আদার বিভিন্ন আকারের প্যাকেজ তৈরি করা হয়।

অধিকাংশ আমদানিকারকরা চায় ৫ ইঞ্চি ঢেউ খেলানো বোর্ড দিয়ে তৈরি করা বাক্সে প্যাক করা আদা। অবশ্য ১৮ কেজির বাক্সে চাহিদাও আমদানিকারকদের রয়েছে। কোন কোন সময় আদা বস্তায় করেও পাঠানো হয়।

আদার জন্য যদিও কোন আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণী নির্দেশিকা নেই তবুও প্রত্যেকটি প্যাকেজের আদা একই জাত ও মানের হওয়া উচিত।

১.২.১১.৭ হলুদ

৭-৯ মাসে তোলার উপযোগী হয়। এটা নির্ভর করে দেরি/মধ্যম/আগাম পরিপক্ব হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতের উপর। লাঙল বা কোদাল দিয়ে তোলা, মাটি পরিষ্কার করা, ক্ষেত থেকে তোলার পর ২-৩

দিন কিওরিং করতে হয়। শুকনো হলুদ তৈরী করার জন্য ১ ঘন্টা ধরে পানিতে ফোটানো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত ধোঁয়া না ওঠে। যখন ধোঁয়া বেরুতে থাকে তখন রাইজোমগুলো নরম হয়ে যায়, এ অবস্থায় ফোটানো বন্ধ করতে হবে নইলে রং ও সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যাবে। উদহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে

অতিরিক্ত সিদ্ধ করলে -রং নষ্ট হয়ে যায়, কম সিদ্ধ করলে শুকনো হলুদ ভঙ্গুর হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি

ছিদ্রযুক্ত ট্রেতে ১০০ গ্রাম 'সোডিয়াম বাইকার্বনেট' + ১০০ লিটার পানিতে সিদ্ধ করা। ফুটন্ত পানির ক্ষারত্ব হলদে রং ধরতে সাহায্য করে।

শুকানো

বাঁশের পাটিতে অথবা শুকনো মেঝেতে ২´´- ৩´´পুরু করে রোদে শুকাতে হবে। তবে রাত্রিতে গাদা করে ঢেকে রাখতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন ধরে শুকাতে হবে অথবা ৬০ ডিগ্রী সে. এর গরম বাতাস ঢুকিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শুকাতে হবে।

পলিশিং

হলুদের খসেখসে, অনুজ্জ্বল চেহারা জালি লাগানো ড্রামে পুরে ঝাঁকি দিয়ে সমান ও চকচকে করা ও অন্ততঃ ১০ মিনিট ধরে হলুদের গুড়া মিশিয়ে ভালভাবে পলিশ করে নিলে রং উজ্জল হবে।

১.২.১২ কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর কুফল

সম্প্রতি বেশী দাম পাওয়ার জন্য আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আম, কলা, কাঁঠাল, আনারস, টমেটো ইত্যাদি আকর্ষণীয়ভাবে পাকানোর চেষ্টা করেন। এতে ক্রেতাসাধারণ ও ভোক্তা প্রতারিত হয়ে আর্থিক ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েন। এসব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন গ্যাস এবং বিভিন্ন ধরনের হরমন। এসব হরমনের মধ্যে রয়েছে ২, ৪-ডি, ২, ৪, ৫, টি আই,এ,এ, আইবিএ ইত্যাদি। কলা পাকানোর জন্য কলার সাথে ১০০০ পিপিএম ২, ৪-ডি দ্রবণ কলার উপর মাত্র ৩০ সেকেন্ড প্রয়োগ করলে কলা পেকে যায়। পেঁপের ক্ষেত্রে ২০০০ পিপিএম ইথিফোন ও স্বল্প সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণের সাথে ব্যবহার করা হলে ফল পাকার সময় কম লাগে। এছাড়া ক্যালসিয়াম কার্বাইড এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ। এটি এক ধরণের যৌগ যা বাতাসের বা জলীয় সংস্পর্শে এলেই উৎপন্ন করে এসিটিলিন

গ্যাস। যা ফলে প্রয়োগ করলে এসিটিলিন ইথানল নামক বিষাক্ত পদার্থে রুপান্তরিত হয়। আর এই বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে পাকান ফল খেলে মানুষ দীর্ঘমেয়াদি নানা রকম রোগে বিশেষ করে বদহজম, পেটেরপীড়া, পাতলা পায়খানা, জন্ডিস, গ্যাস্ট্রিক, শ্বাসকষ্ট অ্যাজমা, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যান্সারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। এছাড়া মহিলারা এর প্রভাবে বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে পারে। শিশুরা বিষাক্ত পদার্থের বিষক্রিয়ার ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কার্বাইডের বিক্রিয়ার ফলে কাঁচা ফল পাকা ফলে রুপান্তরিত হয়। ফল কাঁচা, কিংবা আধাপাকা অবস্থা থাকুক না কেন কিছু কিছু ফলের বাইরে এবং ভেতরে কেমিক্যালের প্রভাব এতটাই ঘটে যে, ভেতরে বাইরে ফলটির রঙে ও স্বাদে স্বাভাবিকভাবে পাকা ফলের মতো মনে হয়। কোন কোন ফলের বেলায় কেবল তার বাহ্যিক বর্ণ আকর্ষণীয় হয়ে পরে। স্বাভাবিক পাকা ফলের মতো দৃষ্টি নন্দন টকটকে লাল, হলুদ, গোলাপী বর্ণ দেখে ক্রেতা ফল কিনতে আগ্রহী হয়। কিন্তু এতে একদিকে যেমন ফলের পুষ্টি গুণাগুণ নষ্ট হয় অপরদিকে ফল খেতে বিস্বাদ, পানসা, শক্ত ও তেঁতো স্বাদযুক্ত মনে হয়।

কৃত্রিমভাবে পাকানো ফল চেনার উপায় হলো টমেটো, আম, পেঁপে ইত্যাদি ফলকে কৃত্রিমভাবে পাকানো হলে ফলত্বক সুষম রঙ (Uniform) ধারন করে। কলার ক্ষেত্রে ফলত্বক হলুদ বর্ণের থাকলেও কান্ডের অংশ গাঢ় সবুজ রঙের থাকে।

১.৩ ফল ও সবজি টাট্‌কা অবস্থায় বাজারজাত করার প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম

⇨ **কি জানা যাবে:** ফসল সংগ্রহের পদ্ধতি, কিউরিং, সর্টিং, গ্রেডিং, প্রমিতকরনের পদ্ধতিসমূহ।

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** উদ্যান ফসলের উপযুক্ত মূল্য পেতে এবং উদ্যান ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস করতে।

আমাদের দেশে টাটকা সবজি বাজারজাত করার মৌলিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমগুলো হলো: চাহিদা মাফিক গাছ থেকে পণ্য তোলার বয়স নির্ধারণ, গাছ থেকে তোলার পর সেগুলো মাঠে একত্রিত করা, প্যাক করা এবং মাঠ থেকে নির্ধারিত স্থানে পরিবহণ করা। তবে এ কাজগুলোর পরিধি ও মাত্রা নির্ভর করবে বাজারজাত করার স্থানের দূরত্ব এবং তার গুণগত মানের উপর। উন্নত মানের বাজার ব্যবস্থার জন্য অবশ্যই পণ্যকে যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, সুন্দরভাবে ছাটাই, বাছাই, শ্রেণীবিন্যাস, প্রয়োজনমত মোমের আবরণ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। এসব কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা প্রয়োজন কারণ:

⇨ **পণ্যের পরিবহণ খরচ অধিক বিধায় সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য দূরবর্তী বাজারে পাঠাতে হবে।**

⇨ **পণ্য তরতাজা রাখার জন্য সর্বাধিক সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। নিম্নমানের পণ্যের কারনে প্রায়ই আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে হয় এছাড়া পুষ্টিরও অপচয় হয়। এ অবস্থা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না যদি সেটা অবহেলার কারণে ঘটে থাকে।**

ফল সংগ্রহের পদ্ধতির উপরেও গুণাগুণ ও মূল্য নির্ভর করে। কোন ফলই এমনভাবে সংগ্রহ করা উচিত নয়, যাতে ফলের গায়ে আঘাত লাগে অথবা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। সে সব ফল সংগ্রহ করতে গেলে আঘাত লাগার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোকে কাঁচির সাহায্যে বোটার দিকে কেটে নামোনোই উচিত। যে-সব ফল সংগ্রহকারীর নাগালের বাইরে থাকে সেগুলো গাছে উঠে পাড়া উচিত, না হয় কোন বাঁশ জাতীয় দন্ডের অগ্রভাগে কাঁচি জাতীয় অস্ত্র বেঁধে দিয়ে তার নীচে এমনভাবে একটি থলে স্থাপন করতে হয় যাতে কাঁচি দ্বারা কর্তনকৃত ফল থলের মধ্যে সংগৃহীত হয়। দীর্ঘ অথবা খাট মই (Ladder) এর সাহায্যে গাছের প্রান্ত হতে ফল সংগ্রহ করা একটি উত্তম পদ্ধতি। এরুপ ক্ষেত্রে সংগ্রহকারীর কাঁধে ঝুড়ি ঝুলিয়ে নিলে সুবিধা হয়।

১.৩.১ ফসল তোলার বা সংগ্রহ করার পদ্ধতি:

টাটকা ফল ও সবজি সাধারণত দু'ভাবে তোলা হয়

⇨ হাত দিয়ে তোলা/পাড়া

⇨ যন্ত্রের সাহায্যে তোলা

১.৩.১.১ হাত দিয়ে তোলা :

গাছ থেকে হাত দিয়ে ফল ও সবজি সংগ্রহ করার কাজ এমনভাবে করা উচিত যাতে ফল ও সবজির গায়ে আঘাতজনিত ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। সাবধানতার সাথে, ধীরে সুস্থে গর্ত করে মাটির নিচ থেকে অথবা গাছ থেকে সংগ্রহ করা এবং তার পরের সব কাজ যত্ন সহকারে করলে ফল ও সবজির ক্ষয়-ক্ষতি অনেক কমানো যায়। সাবধানতার সাথে গাছ থেকে ফল ও সবজি সংগ্রহ করার কয়েকটি নমুনা চিত্র নিচে দেখানো হলো:

চিত্র: ফল সংগ্রহের বিভিন্ন নমুনা।

কিছু ফল আছে যার বোঁটা গাছের কান্ডের সাথে লেগে থাকার কারণে ফল সংগ্রহের সময় হলে বোঁটায় একটা স্বাভাবিক ভঙ্গুর স্থানের সৃষ্টি হয়। যারা ফল সংগ্রহ করবেন তারা শক্ত করে অথচ নরম হাতে ফলকে ধরবেন এবং নিচের চিত্রে যেমন ভাবে দেখানো হয়েছে ঠিক সে ভাবে ওটাকে ওপরের দিকে তুলে ধরবেন। এতে ফলটি ঐ ভঙ্গুর স্থান থেকে খুব সহজে খুলে হাতের মধ্যে চলে আসবে। যারা এভাবে ফল সংগ্রহ করবেন তাদের হাতের আঙ্গুলে নখ রাখবেন না এবং আংটি জাতীয় কোন জিনিসও পরে থাকবেন না। কারণ নখ এবং আংটি থেকে ফলের গায়ে আঘাত লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

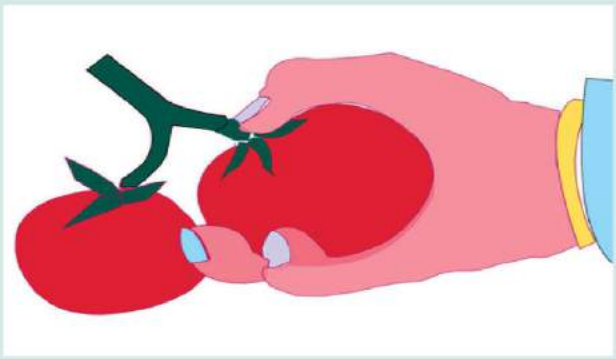

চিত্র: ফল সংগ্রহের কৌশল।

১.৩.১.২ যন্ত্রের সাহায্যে ফসল তোলা:

যদিও হাত দিয়ে পণ্য তোলা আজও অধিকতর পছন্দনীয় পদ্ধতি তবুও প্রয়োজনের সময় শ্রমিকের ঘাটতি এবং শ্রমিকদের নানা ধরনের সমস্যা কিছু কিছু এলাকায় প্রায়ই দেখা দেয়। কতগুলো ফল

আছে যেগুলো গাছ থেকে পাড়তে হলে ফলের বোঁটা কাটতে হয়। কাজেই এ সব ফল পাড়ার জন্য খুব ধারালো ক্লিপার বা ছুরি ব্যবহার করতে হবে। তবে এ সব ফল পড়ার সময় যতটা সম্ভব ফলের গায়ের কাছাকাছি জায়গায় বোঁটাটি কাটতে হবে অর্থাৎ পাড়া ফলের বোঁটার অংশটি যেন, এমন ছোট থাকে যাতে পরিবহণের সময় একই সাথে পরিবহণকৃত অন্য ফলের কোন ক্ষতি করতে না পারে। এ ধরনের ফল পাড়ার একটি নমুনা চিত্র নিচে দেয়া হলো:

চিত্র: যন্ত্রের সাহায্যে ফল সংগ্রহের নমুনা

অনেক ফলগাছ বেশ লম্বা ও উঁচু হয়। এ সব গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় ফলটি মাটিতে পড়ে গেলে ফলের গায়ে অত্যন্ত ক্ষতিকর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে যদি একজন গাছের ওপর থেকে ফল কেটে দেয় এবং অন্য একজন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে একটা চটের বস্তা এক পায়ের ওপর ভর রেখে ধরে তাহলে ঐ গাছ থেকে পড়ন্ত ফল প্রথমে বস্তার ওপর পড়ে তারপর খুব আস্তে গড়িয়ে মাটিতে পড়বে। এতে ঐ ফলে আর তেমন কোন আঘাতও লাগবে না এবং ক্ষতিও হবে না।

যন্ত্রের সাহায্যে ফসল তোলার যেসব বিশেষ সুবিধা রয়েছে তা হলো:

(ক) দ্রুত কাজ শেষ করা

(খ) উন্নত কাজের পরিবেশ পাওয়া এবং

(গ) শ্রমিক নিয়োগ এবং তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়নজনিত অসুবিধাগুলো এড়ানো।

যন্ত্রের সাহায্যে ফসল তোলার অসুবিধা:

- ⇨ পণ্য অথবা গাছের ক্ষয়ক্ষতি।
- ⇨ যন্ত্রের অত্যধিক মূল্য এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে আগের যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা কমে যাওয়া অথবা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়া।
- ⇨ যে সব জায়গায় সহজেই শ্রমিক পাওয়া যায় সেখানে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।

১.৩.২ ফসল তোলার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি:

গাছ থেকে ফল পাড়ার জন্য লম্বা বাঁশের লাঠি, ফল মাটিতে পড়ার আগেই ধরার জন্য বস্তা বা চট। ফল গাছ থেকে পাড়ার জন্য শক্ত সুতা দিয়ে হাতে বোনা অথবা ক্যানভাস দিয়ে তৈরী করা থলে ব্যবহার করা যেতে পারে। গাছ থেকে ফলের বোঁটা ছিঁড়ে নেওয়ার জন্য এ সব থলে রিমের এক পাশে লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হুক লাগিয়ে নেয়া হয়।

চিত্র : সুতা দ্বারা হাতে বোনা ফল পাড়ার থলে।

চিত্র : ফল পাড়ার ক্যানভাসের থলে।

১.৩.৩ ফসল তোলার পাত্র:

যারা গাছ থেকে ফল পাড়ে এবং ক্ষেত থেকে সবজি তোলে তাদের সাথে এমন সব সামগ্রী রাখা হয় যাতে তোলা পণ্যের কোন ক্ষতি না করে ভালভাবে রাখা যায়। একেক রকম ফসল একেকভাবে তোলা হয় বলে ধারণ সামগ্রী ও পৃথক পৃথক রকমের হয়ে থাকে, যেমন: মই এ উঠে যদি কেউ গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করে তাহলে অবশ্যই তাকে তার শরীরের সাথে বেঁধে নেয়া যায় এমন ধরণের বস্তুই নিয়ে উঠতে হবে এবং এগুলোও পণ্যের ভঙ্গুরতার ওপর নির্ভর করেই তৈরি করা হয়।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি গাছ থেকে পাড়া পণ্যের ধারণ সামগ্রীর নাম নিচে উল্লেখ করা হলো:

- ফল পাড়ার থলে
- প্লাষ্টিকের তৈরি ঝুড়ি
- প্যাড লাগানো ঝুড়ি (বাঁশ/বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি কাপড়ে মোড়া)
- হালকা কাঠের তৈরি বাক্স

পণ্য তোলার সময়, মাঠ থেকে নিয়ে কোন একটি জায়গায় একত্রিত করা অথবা স্থানীয় কোন বিক্রয় কেন্দ্রে পরিবহনের জন্য, দূরস্থানে পাঠানোর উদ্দেশ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে বিভিন্ন ধরণের ধারণ ও বাহন সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, একটি পণ্য যত কম বার ধারণ পাত্র এবং পরিবহণ যানের বদলের সুযোগ পাবে ততই পণ্য অক্ষত থাকবে। এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন পণ্য সব সময় ছায়াযুক্ত স্থানে রাখা হয়। অনেকগুলো স্পর্শকাতর ফল আছে যেমন-ষ্ট্রবেরী, আঙ্গুর ইত্যাদি গাছ থেকে তোলার পর ধারণ পাত্র থেকে সরাসরি বাজারজাত করার চূড়ান্ত প্যাকেজে স্থানান্তর করা হয় এবং ঐভাবেই পরিবাহিত হয়ে খুচরা বাজারে চলে আসে। পণ্য বিনষ্টকারী অনুজীবানুর আক্রমন প্রতিরোধ করার জন্য মাঠে ধারণ করার পাত্রগুলো অবশ্যই পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং পাত্রের ভেতর এমন হতে হবে যাতে কোনক্রমেই পণ্যের গায়ে কোন ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। অধিকাংশ দেশেই এখন আর এসব ধারণ বা পরিবহণ পাত্রগুলো কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় না।

প্রায় সবই তৈরি হয় এখন 'পলিপ্রোপাইলিন' সামগ্রী দিয়ে। এগুলো সস্তা, টেকসই এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ।

চিত্র: ফল পাড়ার নানারকম ঝুড়ি।

১.৩.৪ গাছ থেকে ফল পাড়ার সতর্কতা:

- ⇨ পুষ্টতা সঠিকভাবে নির্ধারণ করে ফল পাড়ার কাজ শুরু করতে হবে কারণ অপুষ্ট ফল পাড়লে তা ঠিকমতো পাকে না এবং স্বাদ, রং, সুবাস ইত্যাদির ঠিকমতো উন্নয়ন ঘটে না।
- ⇨ গাছের ফল যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ফল সংগ্রহের কাজে শ্রমিকরা সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে কাজ করছে কি না তা নিশ্চিত হতে হবে। এছাড়া ঝাঁকি দিয়ে ফল পাড়া ঠিক নয়।
- ⇨ গাছ মোচড়ানো, ফল মাটিতে ফেলে দেয়া, ফলের গায়ে আঘাত দেয়া, ফলের গায়ে মাটি লাগানো, সংগৃহীত ফলে সূর্যের তাপ লাগানো পরিহার করতে হবে।
- ⇨ ফল বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এতে রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
- ⇨ সকাল বেলা ফল পাড়া ভালো, কারণ তখন আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে। বৃষ্টির দিনে ফল পাড়া পরিহার করতে হবে।
- ⇨ গাছ থেকে ফল পাড়ার পর দীর্ঘক্ষণ তা গাছের নিচে জমা করে রাখা ঠিক নয় কারণ বাতাসে ভাসমান রোগের জীবাণু এ সময় আমের বোঁটায় আক্রমণ করার সুযোগ পায় ও বোঁটা পঁচা রোগের সৃষ্টি করে।
- ⇨ কিছু বোঁটাসহ ফল সংগ্রহ করা ভালো। আমের ক্ষেত্রে ৩-৪ সে.মি. বোঁটাসহ আম সংগ্রহ করলে বোঁটা পঁচা রোগের প্রকোপ অনেক কমে যায়। অবশ্য গাছ ছোট হলে এটা সম্ভব হয়।
- ⇨ ফল সংগ্রহ করার জন্য সব সময় ধারালো ছুরি ব্যবহার করতে হবে। ছোট গাছের ফল পাড়ার জন্য সিকেচার ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

⇨ প্রত্যেক ফলের বোঁটায় একটি নরম জায়গা থাকে সেখানে চাপ দিলে বোঁটা সহজেই ভেঙে যায়।

⇨ আম পাড়ার পর কিছুক্ষণ উপুড় করে রাখা ভালো, এতে ফলের আঠা আমের গায়ে লাগতে পারে না।

১.৩.৫ মাঠ থেকে পরিবহণ

মাঠ থেকে প্যাকিং করার স্থান পর্যন্ত পণ্য সাধারণত মাটির রাস্তা দিয়ে বিভিন্ন ধরণের পরিবহণ যানে নেয়া হয়। পরিবহণ থেকে শুরু করে বাজারজাত করা পর্যন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে পণ্যের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অত্যন্ত যত্ন সহকারে বিবেচনা এবং সম্পন্ন করতে হবে।

⇨ যানবাহনে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পণ্য যেমন তেমন ভাবে তোলা না হয় এবং পণ্য ভর্তি পাত্রগুলো আছড়ে ফেলা না হয়।

⇨ মাটির রাস্তাগুলো উঁচুনিচু, এবড়ো থেবড়ো না থাকা এবং রাস্তার যেখানে সেখানে গর্ত না থাকা ভাল অর্থাৎ মাটির রাস্তাগুলো সব সময় সমান থাকা বাঞ্ছনীয়।

⇨ সম্ভব হলে খারাপ রাস্তা পরিহার করতে হবে।

⇨ নিয়ন্ত্রিত গতিতে পণ্য বোঝাই গাড়ি চালাতে হবে যাতে ঝাঁকুনির ফলে পাত্রে চাপ না পড়ে।

⇨ গাড়িতে প্যাড সহ রোগ জীবাণুমুক্ত লাইনিং দেয়া যেতে পারে।

⇨ সব অবস্থাতেই পণ্য ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে এবং আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৩.৬ ফসলের কিউরিং

যে পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষেত থেকে পণ্য তোলার পর ছায়াযুক্ত, শুষ্ক, ঠান্ডা, বায়ু চলাচল উপযোগী স্থানে রেখে ফসল অনুযায়ী কাপড়/খড়/বস্তা ইত্যাদি দিয়ে ঢেকে কয়েকদিন রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়, তাকে কিউরিং বলে। কিউরিং-এর ফলে ফসলের বাইরের অংশে কোন ক্ষত থাকলে শুকিয়ে যায়। তাছাড়া বহিরাবরণ শক্ত হয়ে জলীয় ডপদ্ধার্থ বের হওয়া রোধ করে। যা ফসলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এতে পণ্যের ওজন, আকার, আকৃতি ও নিজস্ব গুণাবলী যতটা সম্ভব বজায় রাখতে সাহায্যে করবে। পেঁয়াজ, রসুনের বেলায় এদের 'নেক টিসু' ও বাইরের পাতাগুলোকে ভালভাবে শুকানো হয়। গুদামে রাখার আগেই নষ্ট হয়ে যাওয়া পেঁয়াজ-রসুনগুলো বেছে ফেলে দিলে পরবর্তীতে অতিরিক্ত ক্ষতির হাত থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়। মাঠেই কিউরিং করতে হলে, পেঁয়াজ রসুন হাত দিয়ে তুলে, পাতা কেটে ফেলার আগেই ৫-৭ দিন ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তবে মাঠে শুকানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন বালবে সরাসরি রোদ লাগতে না পারে। অনেক সময় পেঁয়াজ, রসুন তোলার পর শিকড়, পাতা কেটে ফেলে দিয়ে 'বারলাপ ব্যাগে ভর্তি' করে ৩-১৪ দিন শুকানো হয়। তাছাড়া প্যাকিং হাউসে অথবা

তার কাছাকাছি জায়গায় শুকানোর বিশেষ ব্যবস্থাধীনেও কিউরিং করা হয়। ২৫-৩২ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় শুকালে পেঁয়াজের খোসায় সবচেয়ে ভাল রং ধরে। ক্ষেত থেকে তোলার পর পণ্যকে তাপ থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। অল্প সময়ের জন্য হলেও সূর্যের আলোয় পণ্যের উত্তাপ অনেক বেড়ে যায়। তাপমাত্রা ফলের যে ক্ষতি করে তা আর পূরণ করা যায় না, যা ঐ ফলকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নষ্টই করে ফেলে।

সূর্যের আলোয় উত্তাপ বৃদ্ধি ছাড়াও পণ্য রোদে পোড়া হয়ে যায় এবং অনেক বাজারেই এগুলো বিক্রি করা যায় না। কাজেই পণ্য তোলার পর তা সাময়িকভাবে গাছের ছায়ায় কিংবা তাবুর নিচে অবশ্যই রাখতে হবে। তাছাড়া তোলার কাজটিও দিনের বেলায় ঠান্ডার সময় (খুব ভোরে) শেষ করা এবং তোলার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা মাঠ থেকে সরিয়ে নেয়া উত্তম। পরিবহণের সময় পণ্য সামগ্রী ঢেকে নিতে হবে যাতে পণ্যের ওপর চাপ না পড়ে। ঢাকার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঢাকনা এবং পণ্যের মাঝে বাতাস চলাচলের মত জায়গা থাকে। ঢাকা দেয়ার কাপড় বা টারপলিন পানি দিয়ে ভিজিয়ে নেয়া যেতে পারে। এতে পরিবেশ ঠান্ডা থাকবে অর্থাৎ যেভাবেই হোক পরিবহণকৃত সামগ্রীর মধ্যে উত্তাপ যাতে না বাড়ে তা সর্বোতভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

১.৩.৬.১ মূল কন্দাল ও শ্বল্ক জাতীয় ফসলের কিউরিং

মাঠে কিউরিং

চিত্রঃ মাঠে আলু কিউরিং এর নমুনা

মাঠে আলু ও অন্যান্য গ্রীষ্মমন্ডলীয় মূল ও কন্দাল জাতীয় ফসল সমূহ মাঠের ছায়াযুক্ত জায়গায় গাদা করে কিউরিং করা যায়। কাটা ঘাস অথবা খড় তাপ-অপরিবাহি দ্রব্য হিসেবে পণ্যের গাদা ঢাকার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। পণ্যের গাদা, ক্যানভাস, বারল্যাপ অথবা ঘাসের বোনা মাদুর দিয়েও ঢেকে রাখা যায়। কিউরিং এ উচ্চ তাপ ও বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতার প্রয়োজন হয় বলে এ ধরনের ঢাকনা পণ্য থেকে উৎপাদিত তাপ ও জলীয় বাষ্প ধরে রাখতে সমর্থ হবে। এভাবে তৈরি পণ্যের গাদা চার দিনের মত রেখে দিতে হবে।

পেঁয়াজ-রসুনও মাঠে কিউরিং করা যায় যদি গাছ শুকনোর পর ক্ষেত থেকে তোলা হয়। এসব পণ্য খোলা জায়গায় বাতাসে সারি করে রেখে অথবা বড় জালির বস্তায় ভরে কিউরিং করা যায়। এভাবে পণ্য মাঠে পাঁচ দিন রেখে দিতে হবে, এদের বাইরের খোসা ও গোড়ার অংশ ভালভাবে শুকিয়েছে কিনা তা প্রতিদিন পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এভাবে কিউরিং করতে প্রায় ১০ দিনের মত সময় লাগতে পারে, তবে তা নির্ভর করবে আবহাওয়ার অবস্থার উপর।

যেসব অঞ্চলে সূর্যতাপ প্রখর ও বাতাসের আর্দ্রতা বেশি কিন্তু বাতাসের স্বাভাবিক গতি কম সেখানে বাতাস চলাচলের বিশেষ সুবিধা সম্বলিত ছাউনি কিউরিং এর সহায়ক হতে পারে। এ ধরনের ঘরের

মেঝেতে টারপলিন বিছিয়ে সিলিং ফ্যানের নিচে পণ্য বোঝাই বস্তা গাদা করে রেখে দিতে হবে।

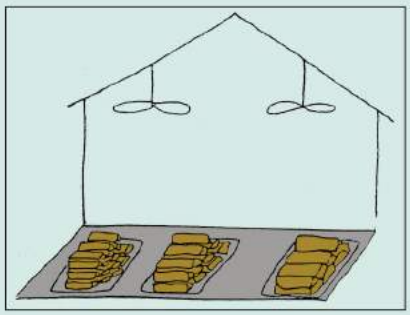

চিত্র: ঘরের মেঝের ওপর টারপলিন বিছিয়ে সিলিং ফ্যানের নিচে পণ্য বোঝাই বস্তা কিউরিং এর নমুনা

১.৩.৬.২ বাতাস দিয়ে কিউরিং করা

কিউরিং কক্ষের সব জায়গায় সমানভাবে তাপ পাওয়ার জন্য কক্ষের মেঝের কাছ দিয়ে তাপ প্রবেশ করাতে হবে, মেঝের ওপর পণ্য ভর্তি বিনের কাছাকাছি জায়গায় হিটার বসানো যেতে পারে অথবা বাইরে থেকেও তাপ কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করানো যেতে পারে। মেঝে ভিজিয়ে দিয়ে কক্ষে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ানো যেতে পারে।

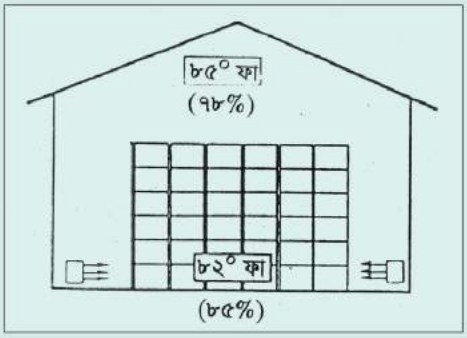

চিত্র: গরম বায়ুর সাহায্যে কিউরিং এর নমুনা

আর যদি হিটার কক্ষের সিলিং এর কাছাকাছি স্থানে স্থাপন করা হয়ে থাকে তাহলে, ফ্যান লাগাতে হবে, যাতে তাপ কক্ষের নিচে যেখানে পণ্য রাখা আছে সেখান পর্যন্ত ভালভাবে পৌছাতে পারে। পণ্য ভর্তি বীজগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন দু' সারি বিনের মাঝে ১০-১৫ সেন্টিমিটার (৪-৬ ইঞ্চি) খালি জায়গা থাকে। এতে বাতাস চলাচলের সুবিধা হবে।

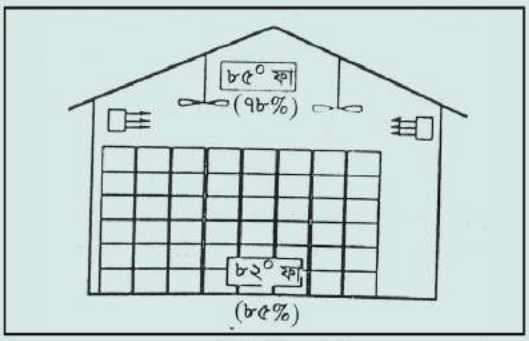

চিত্র: উত্তপ্ত বায়ুর সাহায্যে কিউরিং (বিনের মাঝে ফাঁক রেখে)

১.৩.৭ ফসল পরিষ্কারকরণ (ক্লিনিং)

সংগ্রহের পর রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের হাত থেকে সবজি ও ফলকে রক্ষা করার জন্য এবং আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি কমানোর জন্য সবজি ও ফলকে বিক্রয়ের পূর্বে ভালভাবে পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া অধিকাংশ ফসলই মাঠে থাকা অবস্থায় রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করা হয়। এসব রাসায়নিক দ্রব্য খুব কম পরিমানে হলেও মানুষের জন্য ক্ষতিকর। তাই ফল ও সবজি মোড়কে ভরার আগে ভালভাবে পরিষ্কার করা জরুরী।

পরিষ্কার করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো পরিষ্কার পানি দিয়ে ফল ও সবজি ধোয়া। ফল ও সবজিকে ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য কয়েকবার পানিতে ধোয়া উত্তম। পরিষ্কার পানির পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকলে ক্লোরিন পানিতে ফল ও সবজি ধুয়ে নেয়া যায়। কিন্তু ক্লোরিন অত্যন্ত বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পর্দাথ যা মানুষের শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। তাই ক্লোরিন ব্যবহার করলে সঠিক নিয়মে ও সঠিক পরিমানে ব্যবহার করতে হবে। তবে রাসায়নিক পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্য বর্তমানে এসবের ব্যবহার অনুৎসাহিত করা হচ্ছে। রাসায়নিক পর্দাথ ব্যবহার না করে হালকা গরম পানিতে ফল ও সবজি ধুয়ে বাজারজাত করলেও রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। নিচে একটি ফল পরিষ্কারক যন্ত্রের চিত্র দেয়া হলো:

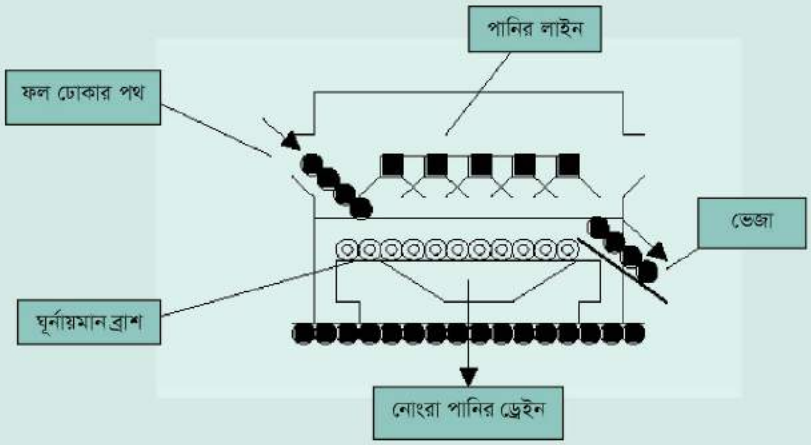

চিত্র: ফল পরিষ্কারক যন্ত্র

পরিষ্কারকরনের গুরুত্ব:

- ⇨ সংগ্রহের পর রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের হাত থেকে সবজি ও ফলকে রক্ষা করে।
- ⇨ আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করে।
- ⇨ ফসলকে ক্রেতার কাছে আকর্ষণীয় করে, ফলে এর বাজারমূল্য বৃদ্ধি পায়।

- ⇨ সংরক্ষণকালীন সময়কে দীর্ঘায়িত করে।
- ⇨ ফল ও সবজির গুনগত মান ঠিক রাখতে সাহায্য করে।
- ⇨ ফল ও সবজি খাদ্য হিসেবে মানুষের জন্য নিরাপদ করে।

১.৩.৮ ফসল সর্টিং (Sorting) পদ্ধতি:

চিত্র: স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার জন্য বাছাই ও পৃথক করা সবজি

যে সমস্ত ফল অতিরিক্ত পেকে গেছে অথবা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, ঐগুলো যথাশীঘ্র ব্যবহার না করলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ভাল ফলের সাথে মিশ্রিত থাকলে পণ্যের মান খারাপ হয়ে যেতে পারে। এ জন্য ঐ সমস্ত ফল বেছে নিয়ে নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখা অথবা নিকটস্থ বাজারে বিক্রয় করা যেতে পারে। কখনও কখনও নানারুপ ফলজাত দ্রব্য (Fruit Products) তৈরীর কাজেও এধরণের ফল ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ ফসলের মান, কাঁটা, ফাঁটা, পরিপক্কতা, থেঁতলানো এসব দেখে পণ্য বাছাই করাকে সর্টিং বলা হয়।

১.৩.৯ ফসল গ্রেডিং (Grading) করার পদ্ধতি:

চিত্র: স্থানীয় বাজারে বিক্রি করার জন্য বাছাই ও পৃথক করা সবজি

ভাল মান এবং গুণসম্পন্ন ফল সবসময়ই ছোট বা খারাপ মানের ফল অপেক্ষা অধিক অর্থ আনায়ন করে থাকে। সব আকারের ও প্রকারের ফলকে একসঙ্গে না রেখে, আকার ও গুণ অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিলে, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষেই সঠিক মূল্য নির্ধারণের সুবিধা হয় এবং উভয়েই লাভবান হয়। সুতরাং বিক্রয়ের জন্য ফল বাক্সবন্দী করা অথবা স্থানান্তরিত করণের পূর্বেই সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে নেয়া উত্তম। একই বস্তা, ঝুড়ি বা বাক্সের নীচে ছোট এবং উপরে প্রদর্শনের জন্য বড় আকারের ফল রাখার প্রথাটি একান্তভাবে বর্জনীয়। ফল কয়েকটি সুনির্দিষ্ট মানে বিভক্ত করণ (Standardization) একটি অতি উত্তম পদ্ধতি।

সবজি বা ফল গ্রেডিং অর্থাৎ বিভিন্ন সাইজে ভাগ করার জন্য গ্রেডিং যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। যেমন: আলুর গ্রেডিং করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শক্তিচালিত আলু গ্রেডিং যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। নিম্নে এই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো:

- ⇨ সাইজ অনুসারে আলু চার ভাগে আলাদা করা হয়।
- ⇨ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত লৌহ সামগ্রী দ্বারা এ যন্ত্র তৈরি করা হয়।
- ⇨ গ্রেডিং যন্ত্রটি ৪ অশ্বশক্তি বিশিষ্ট মটর ইঞ্জিন দ্বারা চালানো যায় এবং যন্ত্রটি সহজে বহনযোগ্য।
- ⇨ ঘন্টায় প্রায় ১.৬ টন আলু বিভিন্ন সাইজে ভাগ করা যায়।
- ⇨ যন্ত্রটির মূল্য ২৪ হাজার টাকা (মটরসহ)।
- ⇨ গ্রেডিং-এর খরচ প্রতি টনে ৪৫ টাকা (প্রতি ঘন্টায় ৭২ টাকা)। বাৎসরিক লাভ ৪৫০০ টাকা।

চিত্র: BARI উদ্ভাবিত আলু গ্রেডিং যন্ত্র

১.৩.১০ প্রমিতকরণ (Standardization) পদ্ধতি:

বিক্রয়ের জন্য তাজা পণ্যের শ্রেণীকরণের সর্বজনগ্রাহ্য তুল্যমানই হলো স্ট্যান্ডার্ড।

স্ট্যান্ডার্ডের ঠিক করতে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে তা হলো:

- ⇨ স্ট্যান্ডার্ডের যথাযথ সংজ্ঞা থাকতে হবে।
- ⇨ সময় ও দুরত্বের জন্য গুনাগুন নষ্ট না হবার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

কেন এবং কখন স্ট্যান্ডার্ড এর প্রয়োজন:

প্রমিতকরণ (Standardization) ও শ্রেণীকরণ সাধারণত যে কারণে করা হয় তা হলো:

- ⇨ উৎপাদন, পাইকারী ও খুচরাকারবারী এদের সকলের নিকট পণ্যের গুনমান সম্পর্কে সাধারণ ধারণা সৃষ্টি করা।
- ⇨ বাজারের জন্য প্রস্তুতি, প্যাকেজিং এবং লেবেলিং এ সহায়তা করা।

⇨ তুলনামূলক মান নির্দিষ্ট থাকায় যে কোন ধরনের বাজার প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।

⇨ মান অনুযায়ী বাজার দর নির্ধারিত হয় বলে উন্নত মানের পণ্য তৈরী ও বিপণনে উৎসাহিত করা।

⇨ যে কোন ধরনের বিরোধ মীমাংসা কিংবা প্রাপ্তি পরিশোধে সহায়তা করা।

সাধারণত বাহ্যিক এবং সম্ভব হলে মাপা যায় এমন নিয়ামক ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতে হবে যেমন :

⇨ পরিপক্কতা, রং, কাঠিন্য, আকার ও আয়তন।

⇨ ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য ত্রুটি সহনশীল মাত্রা।

১.৩.১১ ফসল বাজারজাতকরণের পূর্ব প্রস্তুতি:

ফসল সংগ্রহের পর কিউরিং, ক্লিনিং, সর্টিং, গ্রেডিং এরপর প্রয়োজন প্যাকিং কার্যক্রম সম্পাদন করা। এক্ষেত্রে প্যাকিং শেড একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা। এখানে পার্শ্ববর্তী মাঠ থেকে তুলে আনা টাটকা পণ্য সামগ্রী এনে একত্র করা, প্যাক করা, কখনো কখনো সাময়িকভাবে গুদামজাত করা এবং এখান থেকে দূরবর্তী শহরের বাজার, বিদেশী বাজার এবং অন্যান্য বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। এ জায়গাতেই উৎপাদনকারীদের সাথে মধ্যসত্ত্বভোগীদের (মিডলম্যান) দেখা হয়, বাজার সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যের আদান প্রদান হয় এবং কি ধরনের ফসল উৎপাদন লাভজনক হবে এসব তথ্য জানার পর ভবিষ্যৎ ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

প্যাকিং হাউজগুলো স্থায়ী বা অস্থায়ী ছায়াযুক্ত বৃহদাকার খোলামেলা ঘরে হতে হবে, যার আবহাওয়া স্বাভাবিকভাবে যতটা সম্ভব ঠান্ডা রাখতে হবে। এগুলো ঢেউটিন অথবা সাধারণ বাঁশের চাটাই দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে। শেডগুলো কি দিয়ে তৈরি করা হবে সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর প্যাকিং এর কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার মত যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। এখানে প্যাকিং সামগ্রী সংরক্ষণের সুবিধাসহ সাময়িক এবং বেশি সময় ধরে পণ্য সামগ্রী সংরক্ষণের সুবিধা এবং পরিবহণ করার জন্য যানবাহন চলাচলের সব সুবিধাও থাকতে হবে। এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য নিয়োজিত ব্যবস্থাপকদের অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এ ছাড়াও অবস্থান ভেদে আরও কিছু বাড়তি অথচ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সুবিধা থাকতে হবে। যেমন: অস্থায়ীভাবে থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম ও দায়দায়িত্ব পালনের সুবিধাদি সম্বলিত সুবিন্যস্ত প্যাকিং শেডের চিত্র নিম্নে দেখানো হয়েছে। অনেক প্যাকিং হাউসে তিনটি পৃথক সংরক্ষণ এলাকা থাকে।

⇨ পণ্য সংগ্রহ এলাকা

⇨ পণ্য প্রস্তুত ও প্যাক করা এলাকা এবং

⇨ প্রেরণ এলাকা

১.৩.১১.১ বাছাই ও প্যাকিং স্ট্যান্ড

ফল বাছাই ও প্যাকিং স্ট্যান্ডের একটি নমুনা চিত্র নিচে উপস্থাপন করা হলো:

চিত্র- বাছাই

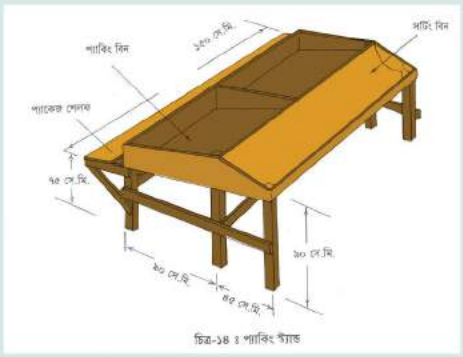

চিত্র-১৪ ঃ প্যাকিং স্ট্যান্ড

চিত্র- প্যাকিং স্ট্যান্ড

আকৃতি নির্ধারণী রিং এর দুটো চিত্র নিচে দেখানো হলো:

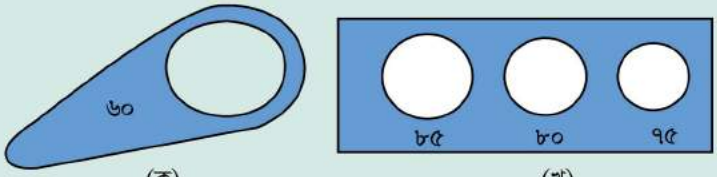

(ক) (খ)

চিত্র: পণ্যের আকার নির্ধারণী রিং এর নমুনা

১.৩.১১.২ প্যাকিং কার্যক্রম:

একটা গোলাকার ঘূর্ণায়মান টেবিল বিভিন্ন ধরণের পণ্যের প্যাকিং এর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পণ্যগুলো কনভেয়ারের মাধ্যমে অথবা সরাসরি টেবিলে স্থাপন করা হয় এবং সেখান থেকে প্যাকাররা পণ্য বাছাই করে কার্টুনে বোঝাই করে। এ টেবিলের সাপ্লাই বেল্টের নিচে বর্জ্য নিস্কাশন বেল্ট লাগানো থাকে, যে বেল্ট দিয়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন সব পণ্য সহজেই বাদ দেয়া যায়।

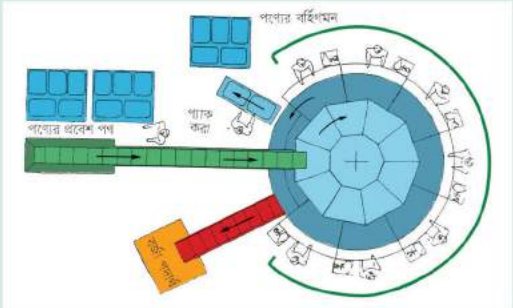

চিত্র: গোলাকার ঘূর্নায়মান টেবিলের বিভিন্ন ধরণের পণ্য প্যাক করার নমুনা

১.৩.১১.৩ হাত দিয়ে প্যাকিং

অনেক ফলমূল ও শাক-সবজি হাতে প্যাক করা হয়। যেমন: আম, ব্রোকলি, সীম, ছোট শসা, ধনে পাতা এসব। এ ক্ষেত্রে ফলের আকার-আকৃতি অবশ্যই এক রকম হতে হবে। কারণ হাত দিয়ে প্যাকিং করলে তা অনেক আকর্ষণীয় ও সুন্দর করে সাজানো যায়। প্যাকিং এর জন্য বাক্স, ট্রে, মোড়ক ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। রপ্তানী করার জন্য যে প্যাকিং করা হয় তা পণ্যের নির্ধারিত পরিমাণ অথবা সংখ্যায় করতে হবে এবং তা যথাযথ সরকারী আইন অথবা ব্যবসা/শিল্প নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

১.৩.১১.৪ সাময়িক গুদামজাতকরণ

প্যাক করা সামগ্রী গন্তব্যস্থানে পাঠানোর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রাখতে হলে তা অবশ্যই ঠান্ডা জায়গায় রাখতে হবে। যদি বাষ্পায়িত ঠান্ডা অথবা যান্ত্রিক ঠান্ডা করার সুবিধা পাওয়া যায়, তা হলে তা ব্যবহার করতে হবে। তবে যান্ত্রিকভাবে ঠান্ডা করা পণ্য সামগ্রী পরবর্তী পর্যায়েও ঠান্ডা রাখার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। যদি ঠান্ডা করা পণ্য সামগ্রী পরেও ঠান্ডা রাখার সুবিধা নেই এমন পরিবহণ ব্যবস্থায় পাঠাতে হয় তা হলে তা অবশ্যই খুব সামান্য সময়ের জন্য হতে হবে। এটা সড়ক পথে অথবা আকাশপথে উভয় পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রযোজ্য।

পুরো ঠান্ডা রাখার সুবিধাজনক পরিবেশে ফল ও সবজি প্যাকিং করার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডায় নষ্ট হয় না এমন সব পণ্য এবং যেগুলো ঠান্ডায় নষ্ট হয়ে যায় সেগুলো ১০-১৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় রাখতে হবে। অবশ্যই তা বিভিন্ন পণ্য অথবা পণ্য গোষ্ঠীর নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে। উন্নত বাজারে চাহিদা মেটানোর জন্য ঠান্ডা করার ব্যবস্থা, প্যাকিং হাউসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। এ ব্যবস্থা উন্নয়নশীল দেশেও স্থাপনের চিন্তা ভাবনা জরুরী ভিত্তিতে করতে হবে। কারণ শহর ভিত্তিক বাজারের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর চাহিদা লাভজনকভাবে মেটাতে এ সব আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই।

১.৪ ফল ও সবজি প্যাকিং ও পরিবহণ

⇨ **কি জানা যাবে:** উদ্যান ফসলে প্যাকেজিং ও পরিবহণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** উদ্যান ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাস ও উপযুক্ত মূল্য পেতে।

অন্যান্য পণ্যের ন্যায় কৃষি পণ্যও বাজারজাতকরণের পূর্বে প্যাকেজিং এর প্রয়োজন। কৃষি পণ্যের প্যাকেজিং এমন হওয়া প্রয়োজন যা পণ্যের গুনগতমান রক্ষা করে পণ্যকে পঁচনশীলতার হাত থেকে রক্ষা করবে। অমাদের দেশে কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং এর বিষয়ে বিশেষ নজর না দেয়ার কারণে ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমান বৃদ্ধি পায়। প্যাকেজিং আধুনিক যুগে এত গুরুত্বপূর্ণ যে অনেকে একে বিপণন শাস্ত্রের বিখ্যাত 4P ধারনার সাথে যোগ করে 5P বলে থাকেন। কারণ প্যাকেজিং এর আদ্যক্ষরও P, অনেক বিপণন শাস্ত্রবিদ প্যাকেজিংকে পণ্য কৌশল এর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে থাকেন। অর্থাৎ প্যাকেজিং পণ্যের একটি অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

১.৪.১ প্যাকেজিং কি?

কোন পণ্যের প্যাকেট বা আবরণ এর ডিজাইন তৈরী ও উৎপাদন সংক্রান্ত কাজকে প্যাকেজিং বলে। পণ্যের আবরন (Wrapper) বা পাত্র (Container) কে প্যাকেজ বা প্যাকেট বলে। প্যাকেজ এর ২ বা ৩টি স্তর হতে পারে। যথা: (ক) প্রাথমিক স্তর (খ) মাধ্যমিক স্তর (গ) পরিবহন বা জাহাজীকরণ স্তর। যেমন: গাছ থেকে কলা কাটার পর প্রথমে ১ ডজন এর একটি পলিথিন বা কাগজের প্যাকেট করা হলো, এটাকে বলে প্রাথমিক প্যাকেজ বা স্তর। এরপর ৬ ডজন এর একটি করোগেটেড বক্স (Carton) করা হলো, এটাকে বলে মাধ্যমিক প্যাকেজ বা স্তর। অভ্যন্তরীন বা রপ্তানী বাজারে কলা পরিবহনের জন্য যদি আবার বড় কোন প্যাকেজ ব্যবহার করা হয় তবে সেটা হবে পরিবহন বা জাহাজীকরণ স্তর। যেমন: কলা রপ্তানীর ক্ষেত্রে জাহাজীকরণের বা পরিবহনের সুবিধার্থে বড় ষ্টিল কনটেইনার ব্যবহার করা হয়। আবার প্রক্রিয়াজাতকৃত কোন পণ্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিক প্যাকেট হিসেবে কাঁচের বোতল, অতঃপর পণ্যটিকে একটি কাগজের প্যাকেটে উপস্থাপন করা হলে এটা হবে মাধ্যমিক প্যাকেজ। চূড়ান্তভাবে এটাকে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপনার জন্য ৬টি বা ১ ডজন এর প্যাকেজ করা হলে সেটা হবে পরিবহন প্যাকেজ। বর্তমান সময়ে প্যাকেজিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপণন হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্যাকেজিং একটি পণ্য ক্রয়ে যেমন ক্রেতাকে সুবিধা দেয় (পণ্য বহনে সুবিধা) তেমনি এটি উৎপাদনকারীকে বিপণন প্রসারেও (Promotion) সুবিধা এনে দেয় (প্যাকেট দেখে পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হয়)।

১.৪.২ প্যাকেজ বা প্যাকেট তৈরীর উপাদানের শ্রেণী বিভাগ:

প্রথমত প্যাকেজ তৈরীর উপাদান ২ প্রকার, যথা: ক) নরম প্যাকেজ (Soft Package) ও খ) শক্ত প্যাকেজ (Hard Package).

ক) **নরম প্যাকেজ (Soft Package):** যে প্যাকেজ এর প্রকৃতি নরম যেমন: কাগজ, ফোম, এলুমিনিয়াম ফয়েল, পলিথিন, কাপড়, চট ইত্যাদি দিয়ে তৈরী প্যাকেজকে নরম প্যাকেজ বলে।

খ) **শক্ত প্যাকেজ (Hard Package):** যে প্যাকেজ এর প্রকৃতি শক্ত যেমন: কাঁচ, টিন, প্লাষ্টিক, কাঠ, স্টিল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী প্যাকেজকে শক্ত প্যাকেজ বলে।

১.৪.৩ প্যাকেজিং নির্বাচন:

নিম্নোক্ত বিষয় সমূহের উপর ভিত্তি করে প্যাকেজিং নির্বাচন করতে হবে।

- ⇨ পণ্যের প্রকৃতি।
- ⇨ কত সময়ের জন্য মোড়কে থাকবে।
- ⇨ কোন অবস্থায় পণ্য পরিবহন করা হবে।
- ⇨ ব্যবহারের পূর্বে কোন অবস্থায় সংরক্ষণ বা গুদামজাত করা হবে।

১.৪.৪ কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে প্যাকেজ এর ধরণ:

পণ্যকে আঘাতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্যাকেজ করা হয়। উদ্যান ফসল অর্থাৎ শাক-সবজি, ফল-মূল, ফুল ইত্যাদি দ্রুত পঁচনশীল পণ্য। তাই এ জাতীয় পণ্যকে টাটকা রাখার জন্য এবং পরিবহনের সুবিধার্থে প্যাকেজ করা হয়। আমাদের দেশে কৃষি পণ্যের প্যাকেজ এর ক্ষেত্রে সাধারণত নরম (Soft) এবং শক্ত (Hard) এই দুই ধরনের প্যাকেজ ব্যবহৃত হয়। যেমন: নরম প্যাকেজ হিসেবে চটের এবং প্লাষ্টিকের বস্তা ও শক্ত প্যাকেজ হিসেবে ডোল, মটকা, বাঁশের ঝুড়ি, কাঠের বাক্স, প্লাষ্টিকের ক্রেট ও ষ্টিলের ড্রাম ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে রপ্তানীর ক্ষেত্রে সীমিত আকারে কোন কোন সবজি ক্ষেত্রে করোগেটেড বক্স (Carton) ব্যবহৃত হচ্ছে।

১.৪.৫ প্যাকেজিং এর প্রয়োজনীয়তা:

কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর গুরুত্ব অপরিসীম। কৃষি পণ্য বিশেষ করে উদ্যান ফসলের ক্ষেত্রে প্যাকেজিং এর প্রয়োজনীয়তা আরও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়।

নিম্নলিখিত প্রয়োজনে কৃষি পণ্য এবং উদ্যান ফসল প্যাকেজিং করা হয়:

- ⇨ **পরিবহনের সুবিধার্থে:** কৃষি পণ্য এবং উদ্যান ফসল পরিবহনের সুবিধার্থে প্যাকেজ করা হয়।
- ⇨ **সহজ হ্যান্ডেলিং:** পণ্য পরিবহন মাধ্যমে তোলা-নামানো ইত্যাদি ধরণের সুবিধার জন্য কৃষি পণ্য এবং উদ্যান ফসল প্যাকেজ করা হয়।
- ⇨ **সংরক্ষণ:** কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য এবং সংরক্ষণ জনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ করা হয়। কোল্ডষ্টোরেজে আলু সংরক্ষণের জন্য বস্তা ব্যবহার করা হয়।
- ⇨ **বিক্রয় বৃদ্ধি করা:** ক্রেতাকে আকর্ষণ করে পণ্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য প্যাকেজ করা হয়ে থাকে। পণ্য প্যাকেজ করা থাকলে বিক্রেতার যেমন-পণ্য বিক্রয় করতে সুবিধা হয় তেমনি ক্রেতার পক্ষেও পণ্য ক্রয়ের পর বহন করতে সুবিধা হয়। সুন্দর প্যাকেজ করা পণ্যের জন্য ক্রেতা বেশী মূল্য দিতেও প্রস্তুত থাকে।
- ⇨ **ক্রেতা/ভোক্তা সন্তুষ্টি:** অনেক সময় ক্রেতার সন্তুষ্টি বা চাহিদার প্রেক্ষিতে কোন কোন কোম্পানী পণ্য প্যাকেজ করে থাকে। সেক্ষেত্রে সব সময় কোম্পানী এর জন্য অতিরিক্তি খরচ/চার্জ নাও করতে পারে।
- ⇨ **কোম্পানীর ইমেজ বৃদ্ধি করা:** কৃষি পণ্য বা উদ্যান ফসল প্যাকেজ করে বিক্রয় করলে বিক্রেতার বা কোম্পানীর ইমেজ গড়ে উঠে বা বৃদ্ধি পায়। যেমন: অতিসম্প্রতি মুরগীর ডিম মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ সহ কার্টুন বক্সে প্যাকেজ অবস্থায় বাজারজাত হচ্ছে। তেমনিভাবে কলা, আম, টমেটো, আলু ইত্যাদি বাজারজাত করার পূর্বে সঠিকভাবে প্যাকেজিং এর পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে উদ্যান ফসল বিপণনের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্যাকেজিং এর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থার প্যাকেজিং এর পাশাপাশি উৎপাদনের স্থান, জাত, গুনাবলীসহ লেভেলিং এর ব্যবস্থাও ব্যবসায়ী মহল গ্রহণ করতে পারেন।

১.৪.৬ ফল ও সবজির প্যাকিং:

যে সকল কারণে ও প্রয়োজনে অন্যান্য জিনিসপত্র প্যাক করা হয়ে থাকে ফল, শাক-সবজির বেলাতেও সে সব প্রযোজ্য। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে বেশ কতগুলো সুনির্দিষ্ট ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষ কিছু ব্যবস্থা একান্তভাবে নিতে হয়। যেমন এক্ষেত্রে প্যাকিং এমনভাবে করতে হবে যাতে বেশি সময় ধরে প্যাকিং অবস্থায় থাকাকালে প্যাক করা পণ্য অভ্যন্তরীণ সৃষ্ট অতিরিক্ত আর্দ্রতা ও তাপে নষ্ট না হয়ে যায় তার সুবিধা রাখতে হবে। সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপ, আর্দ্রতা, গ্যাস যাতে প্যাক থেকে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে তার সুব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। কাজেই ফল ও শাক-সবজি প্যাক করার জন্য প্যাকিং বাক্স এমনভাবে ডিজাইন ও তৈরি করতে হবে যাতে-

⇨ পণ্য সামগ্রীর গায়ে কোন আঘাত লেগে নষ্ট না হয়।

⇨ প্যাকিং লাইন ও পরিবহণ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

সব প্যাকেজ ব্যবস্থাই ব্যয়বহুল এবং বাড়তি ব্যয় হিসেবে যোগ হয়ে সামগ্রীর উৎপাদন খরচ (বাজারজাত/বিক্রি করার আগ পর্যন্ত) অনেক বাড়িয়ে দেয় বলে বিক্রি থেকে অর্জিত লাভের অংশ অনেক কমে যায়। তাই সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পণ্য সামগ্রীর বাহ্যিক চেহারা ও গুণগত মান সম্পূর্ণ ঠিক রেখে কম বা বেশি দূরত্বের বাজার, বৈদেশিক বাজার ও অভ্যন্তরীণ ঘরোয়া চাহিদা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুসারে যত কম দামের সুষ্ঠু প্যাকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায় তা করতে হবে। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) এক্সপোর্ট প্যাকেজিং ম্যানুয়াল (১৯৮৮) নামে একটি প্রকাশনা তৈরি করেছে। এটা রপ্তানিকারকগণ ব্যবহার করতে পারেন। এ বইটি উন্নয়নশীল দেশে অবস্থিত স্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যায়।

১.৪.৬.১ প্যাকেজিং এর কার্যাবলী

ফল ও শাক-সবজির উত্তম প্যাকেজিং এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরুপ:

(ক) এটা পণ্যের দেহে ক্ষত সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করে।

(খ) এটা একই পণ্য সামগ্রী একটা একটা করে হস্তান্তর করা বন্ধ করে ও পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সহজতর করে।

(গ) এটা পণ্যের শ্রেণী বিন্যাস ভিত্তিক হয় বলে ব্যবসায়ীরা তাদের পছন্দমত আকার আকৃতির পণ্য সহজে বাছাই করে নিতে পারে।

(ঘ) চতুর্থ বৈশিষ্ট্যটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে রপ্তানি বাজার, এমনকি অনেক অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্যও। সেটি হলো এটা পণ্য দ্রব্যকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্যাকেটগুলোই প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহৃত হয় কারণ প্যাকেটের গায়ে লেখা দেখে আগ্রহী ক্রেতাগণ জানতে পারেন। পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন- স্থান, জাত, গুণাবলী ইত্যাদি সম্মন্ধে।

চিত্র ঃ কাঠ দিয়ে বাক্স তৈরী

১.৪.৬.২ পণ্যে ক্ষত না হতে দেয়ার ব্যবস্থাদি

প্যাক করা পণ্যের গায়ে যে যে ধরনের ক্ষত দেখা যায় তার কারণগুলো নিচের ছকে দেয়া হলো

ক্ষতের ধরণ	কারণ
কাটা ও ছিদ্র	ধারালো বস্তু
আঘাতের ফলে থেঁৎলানো	ছুঁড়ে মারা, মাটিতে ফেলে দেয়া, খারাপ রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যাওয়া অথবা দ্রুত যাত্রা শুরু করা।
চাপের ফলে থেঁৎলানো	ধারণপাত্রে বা কনটেইনারে অতিরিক্ত বোঝাই, খারাপভাবে স্ট্যাক করা, পণ্য দ্রব্যের ওপর সরাসরি বাস্কেটের চাপ পড়া, পরিবহণের সময় হঠাৎ কনটেইনার ভেঙ্গে যাওয়া।
ঝাঁকি	পরিবহন যানের যান্ত্রিক অসুবিধার জন্য ঝাঁকি লাগা, এটা আরও বেড়ে যাবে যদি পণ্য সামগ্রী খারাপভাবে প্যাক করা হয় অথবা পরিবহন যানে খারাপভাবে বোঝাই করা হয়।
প্যাক করা পণ্য সামগ্রীতে পরিবেশ জনিত ক্ষত	
তাপ	প্যাকেজ সরাসরি রোদে রাখা। তাপের উৎসের কাছাকাছি গুদামজাত করা অভ্যন্তরীন উত্তাপ সৃষ্টি ও তা বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত বায়ু চলাচল ব্যবস্থার অভাব।
অতিরিক্ত ঠান্ডা ও হিমায়িত জনিত	ঠান্ডায় স্পর্শকাতর পণ্যকে সহ্য করার ক্ষমতার নিচের তাপমাত্রায় রাখা।
জলীয় অংশের পরিমাণ	বৃষ্টিতে ভেজানো অথবা বেশি আর্দ্র পরিবেশে রাখা; প্যাকেজগুলোকে ঘণীভূত করা ও পণ্য সামগ্রীকে হিমায়িত অবস্থা থেকে বাইরের ভেজা পরিবেশে নিয়ে আসা, ভেজা পণ্য কাঠবোর্ড বাক্সে প্যাক করা।
রাসায়নিক দ্রব্যাদি	গুদামে প্যাকেজগুলো রাসায়নিক দ্রব্যাদির কাছাকাছি সংরক্ষণ করা; কাঠের বাক্সে সংরক্ষণকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা।
বায়োলজিক্যাল	ছত্রাক, কীটপতঙ্গ যেমন উইপোকা, তেলাপোকা, মাকড়সা, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণী দ্বারা আক্রান্ত বাক্স ব্যবহার করা।

১.৪.৬.৩ আঘাতজনিত ক্ষত বন্ধ করার পদ্ধতিসমূহ

- ⇨ **প্রত্যেক শ্রেণীর পণ্য সামগ্রী বাক্সে এক এক করে মজবুতভাবে স্থাপন করা যাতে একটা আর একটার সাথে বাক্সের দেয়ালের গা ঘেঁষে ভালভাবে লেগে থাকে।**
- ⇨ **প্রতিটি প্যাকেজ পণ্য দিয়ে ভরা থাকবে কিন্তু উপচে পড়ার মত ভরা হবে না। পণ্য সামগ্রী বাক্সে ভরার সময় হালকা চাপ দিয়ে ভরতে হবে।**

ফলের বেলায় আঘাতজনিত ক্ষত বন্ধ করতে হলে যা বেশি কার্যকর হবে তা হলো বাক্সের ভেতরের দেয়াল নরম জিনিস দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দেয়া। প্রতিটি ফলের জন্য বাক্সে ফলের আকারের কোষ তৈরি করে নিয়ে প্রতিটি কোষে পৃথক পৃথকভাবে একটি একটি করে ফল বসিয়ে দেয়া ও প্রত্যেকটি ফলকে নরম জিনিস দিয়ে মুড়ে দেয়া।

১.৪.৬.৪ প্যাকিং বাক্সের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ

- ⇨ ভিজে নষ্ট হবে না এমন শক্তি সম্পন্ন জিনিস দিয়ে প্যাকিং বাক্স তৈরি করতে হবে যা বিক্রি হওয়া পর্যন্ত সব কার্যক্রম ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে পণ্য সামগ্রীকে সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করবে।
- ⇨ যে জিনিস দিয়ে বাক্স তৈরি হবে তা বিষক্রিয়ামুক্ত হতে হবে ও তা থেকে কোন প্রকার খারাপ গন্ধ যাতে পণ্যে সংযোজিত না হয় এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।
- ⇨ বাক্সের প্যাকেট ওজন, আকার, আকৃতি এমন হতে হবে যাতে তা পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করার সব চাহিদা ও বাজারজাত করা পর্যন্ত সব কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা হয়।
- ⇨ বাক্স প্যাকেট এমন হতে হবে যাতে সংরক্ষিত পণ্য সব সময় ঠান্ডা থাকে অর্থাৎ বাইরের আবহাওয়ার সাথে বাক্সের ভিতরের আবহাওয়ার সহজ আদান প্রদানের নিশ্চয়তা থাকে।
- ⇨ আমদানিকারক দেশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার জন্য বাক্স প্যাকেট যেন সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায় তার সুব্যবস্থাও থাকতে হবে।

১.৪.৬.৫ প্যাকিং বাক্স তৈরি ও প্যাক করার দ্রব্য সামগ্রী

বাঁশ, খড়, নরম কাগজ (পুরাতন খবরের কাগজ) ইত্যাদি কম মূল্যের পঁচনশীল দ্রব্যাদি উন্নয়নশীল দেশে সহজে পাওয়া সম্ভব।

অসুবিধাসমূহ-

(ক) পরিষ্কার ও শোধন করা।

(খ) সীমিত সংখ্যায় ও সময়ের জন্য একই বাক্স বার বার ব্যবহার করা।

(গ) শক্ত বলে সুষ্ঠুভাবে স্ট্যাক বা গাঁদা করার অসুবিধা।

(ঘ) ধারালো কোনা পণ্য সামগ্রীতে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে।

(ঙ) উল্লিখিত সামগ্রী দিয়ে তৈরি করা বাক্স প্রায়ই বেশি বড় আকারের হয় বলে পরিবহনে অসুবিধা ও চাপাচাপি, ঝাঁকুনি ও হঠাৎ চাপ লাগার জন্য পণ্যে ক্ষত সৃষ্টির সম্ভাবনা।

(চ) ফল ও শাক-সবজির উত্তরোত্তর উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশে বাঁশের অভাব দেখা দিতে পারে বলে অন্য ধরনের প্যাকেজিং দ্রব্যাদির ব্যবহার অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হবে।

১.৪.৬.৬ কাঠের বাক্স (নরম জাতীয় কাঠ সবচেয়ে উপযোগী)

একটিই বার বার ব্যবহার করা যায়, শক্ত হয় ও সহজে তৈরি করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

(ক) অনেক দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে কাঠ একটি দুর্লভ সম্পদ ও তা অন্য কিছু না পাওয়া গেলেই কেবল ব্যবহার করা উচিত।

(খ) পরিষ্কার ও শোধন করা কষ্টসাধ্য

(গ) পানি শোষণ করে, ভারী বলে বহণ করা কষ্টসাধ্য, শুকনো অবস্থায় সংরক্ষিত পণ্য দ্রব্য থেকে পানি চুষে নেয়।

(ঘ) প্রায়ই বাক্সের গা খসখসে হয়, এখানে সেখানে তার কাঁটা বেরিয়ে থাকে, তুলনামূলকভাবে অনেক ব্যয়বহুল, বিশেষ করে যদি এগুলো মাত্র একবারই ব্যবহার করা হয়।

১.৪.৬.৭ ঢেউ তোলা কার্ডবোর্ড (ফাইবার বোর্ড) বাক্স

এগুলো হালকা, পরিষ্কার, মসৃণ, বিনষ্ট হয়ে যায়, সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব, বহু ধরণের আকার আকৃতিতে তৈরি করা সম্ভব, ভেঙ্গে গুছিয়ে রাখা যায় ও তাতে গুদামে কম জায়গা লাগে, রপ্তানির জন্য ঢেউ তোলা কার্ডবোর্ড বাক্সই প্রধান উপকরণ, তাই এটি এখন ঐ ধরনের বাজারের জন্য দৃশ্যত অপরিহার্য উপাদান।

অসুবিধাসমূহ

(ক) বার বার ব্যবহার উপযোগী নয় বলে ব্যয়বহুল।

(খ) সহজেই ভিজে যায় ও অযত্নে ব্যবহার করলে নষ্ট হয়ে যায়।

(গ) বিশেষ ব্যবস্থায় পানি রোধক করা যায়, কিন্তু ব্যয়বহুল।

১.৪.৬.৮ প্লাষ্টিক বাক্স

সহজেই পরিষ্কার করা যায়, ও খুব শক্ত; এগুলো খুব মসৃণ ও বার বার ব্যবহার ও ফেরত যোগ্য।

অসুবিধাসমূহ

(ক) প্রথম অবস্থায় অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন,

(খ) দূরবর্তী জায়গা থেকে এগুলো ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা বেশ কষ্টকর,

(গ) রপ্তানি কাজে ব্যবহার করা যায় না,

১.৪.৬.৯ হালকা ওজনের প্লাষ্টিক বাক্স

উপরে বর্ণিত মজবুত ধারণ পাত্রের মত এগুলোরও সুবিধা রয়েছে কিন্তু পুণঃব্যবহারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে।

অসুবিধাসমূহ

(ক) যেহেতু এ ধারণ-পাত্রগুলো তুলনামূলকভাবে নতুন কাজেই এদের সুবিধা অসুবিধাগুলো এখনও পুরোপুরিভাবে পরীক্ষিত হয়নি।

(খ) মান অনুযায়ী পাত্রের আকার, আয়তন ও গুণগতমান ইত্যাদি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১.৪.৬.১০ থলে ও জাল

এগুলো বিভিন্ন আকার, আকৃতি, আয়তন ও শক্তির হতে পারে। প্রাকৃতিক অথবা সিনথেটিক উভয় রকম আঁশ দিয়ে এসব তৈরি করা যেতে পারে। এগুলো হালকা ও কোন কোনটি বার বার ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশে এগুলো সহজে, কম খরচে পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি করা যায়।

অসুবিধাসমূহ

কেবলমাত্র আলু, গাজর, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ও অন্যান্য কন্দাল ফসল রাখার উপযোগী কিন্তু অন্য অনেক কৃষি পণ্য বিশেষ করে কোমল ও নরম জাতীয় পণ্য এতে রাখা যায় না।

১.৪.৬.১১ কাগজ অথবা প্লাষ্টিক ফ্লিপের আস্তরণ দেয়া থলে

এগুলো জলীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে পণ্যকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে, রোগ জীবাণুর আক্রমণ ও আঘাতজনিত ক্ষত প্রতিরোধ করে।

অসুবিধাসমূহ

(ক) দাম বেড়ে যায়,

(খ) তাপ ও গ্যাসের আদান প্রদানে বাধা দেয়।

১.৪.৬.১২ কাঁচের বোতল ব্যবহারের সুবিধা:

সুবিধাসমূহ

- ⇨ কাঁচের বোতল রাসায়নিক ভাবে প্রায় নিষ্ক্রিয়।
- ⇨ পরিষ্কার বোতলে ভর্তি করা খাদ্য সামগ্রী ভোক্তারা সহজে দেখতে পারেন ও ক্রয়ের ব্যাপারে তাৎক্ষনিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
- ⇨ উচ্চ তাপমাত্রায় জীবানুমুক্ত করা সম্ভব।
- ⇨ একবার ব্যবহারের পর পুনরায় ব্যবহার করে খরচ কমানো যেতে পারে।

অসুবিধাসমূহ

(ক) ওজন বেশি।

(খ) ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বিশেষত পরিবহণের সময়।

১.৪.৭ প্যাকেটের আকার, আকৃতি ও পরিচিতি চিহ্ন

প্যাকেটের আকার, আকৃতি, উচ্চতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আকার, আকৃতি ওজন অবশ্যই এমন হওয়া উচিত যাতে ব্যবহার সুলভ হয়, প্রয়োজনমত শক্ত হয়, স্থানান্তর সহজ ও নিরাপদ হয়, যানবাহনে বোঝাই করা ও গাদা করা সহজ হয়।

এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন প্যাকেটের আকার, আকৃতি, ওজন এমন হয় যাতে একজন মানুষ তা সহজে তুলতে পারে অর্থাৎ পণ্য সহ প্যাকেটের ওজন ২০-২৫ কেজির উর্ধ্বে না হয়। এছাড়া প্যাকেটের আকার, আকৃতি এমনই হওয়া উচিত যাতে সেখানে পণ্য সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করা সম্ভব হয়।

প্যাকেটের আকৃতিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে তা পরিবহণ, যানবাহণে বোঝাই করা ও তার বহণ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য। একই জায়গা দখল করলেও গোল ঝুড়িতে তুলনামূলকভাবে আয়তক্ষেত্রাকার বাক্সের চেয়ে কম পণ্য ধরে। সিলিন্ডার আকৃতি বিশিষ্ট পাত্র আয়তকার পাত্রের তুলনায় শতকরা মাত্র ৭৮ ভাগ জায়গা দখল করে থাকে।

উন্নত দেশসমূহে টাটকা ফল ও শাক-সবজি বিভিন্ন অঞ্চল অথবা দেশ থেকে সরাসরি রপ্তানি করা বাক্সের মাধ্যমেই খুচরা বিক্রেতার হাতে এসে পৌছায়। ফলে এ সমস্ত প্যাকেটই ঐ অঞ্চল বা দেশের প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ও এসবের বাহ্যিক চেহারা ও পণ্য বেচা কেনায় সহায়তা করে। অবশ্য এজন্য পরিচিতি লেবেল স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে, পণ্য রাখার পাত্র পরিচ্ছন্ন হতে হবে ও তাতে আকর্ষণীয়ভাবে পণ্য সাজাতে হবে। এসব বিষয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলো বহুদিন থেকে অতিমাত্রায় সচেতন। তবে ইদানিং আরব উপসাগরীয় বাজারগুলোও এ বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠছে।

১.৪.৮ প্যাকেজিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

অতি উন্নত দেশেও ফল ও শাক-সবজির প্যাকেজিং ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতাভুক্ত অনেক কাজই আজও হাতে করতে হয়, বিশেষ করে উপরে তোলার কাজ। এ জন্য প্রত্যেকটি প্যাকেজের ওজন সীমিত মাত্রার মধ্যে রাখা একান্ত প্রয়োজন।

যন্ত্রের সাহায্যে মালামাল উপরে তোলার জন্য প্যাকেজিংএ বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হয় যা অবশ্যই প্যাকিং এর যন্ত্রপাতি ও পরবর্তী সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে নিতে হয়। এসব বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন আপেল দীর্ঘ সময় ধরে গুদামজাত করার জন্য এখনও কাঠের তৈরি পাত্র ব্যবহার করা হয়।

১.৪.৮.১ প্যাকেজিং ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তার সাথে প্যাকেজিং এর খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা

প্যাকেজিং এমনভাবে করতে হবে যাতে পণ্য বাজারজাত করা পর্যন্ত সব কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। এছাড়া প্যাকেজিং এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে তা গুদামে থাকা অবস্থায় গুদামের তাপ ও আর্দ্রতা সহ্য করতে পারে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনায়াসে করা সম্ভব হয় ও নিরীক্ষা শেষে আবার ভালভাবে প্যাকেটগুলো সিল করা যায়। প্যাকেটগুলো যাতে সুষ্ঠুভাবে গাদা করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে প্যাকেটগুলো তৈরি করা উচিত।

প্যাকেজে বাতাস চলাচলের সু-বন্দোবস্ত থাকতে হবে ও তা গুদামে থাকা অবস্থায়, পরিবহণ করার সময় ও বাজারজাত প্রক্রিয়া চলা পর্যন্ত যেন কার্যকর থাকে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য প্রতিটি প্যাকেটে ছিদ্র থাকতে হবে। মান সম্পন্ন প্যাকেটের গাদা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সঠিকভাবে বায়ু চলাচল করতে পারে।

- ⇨ গুদামে জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা,
- ⇨ বিতরণ ব্যবস্থায় সময় কম ব্যয় করা।

এছাড়াও এ ব্যবস্থায় কম হ্যান্ডেলিং হওয়ার কারণে গুণগত মান বজায় রাখা যায়। বড় বাক্সের (প্যালেটের) আকার নানা রকম হতে পারে। পশ্চিম ইউরোপে আন্তর্জাতিক প্যালেট গুলোর মাপ হয় ১০০-১২০ সে.মি.। আঞ্চলিক 'ইউরোপ্যালেট' এর মাপ হয় ১২০-১৮০ সে.মি.। এ দু' মাপই আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত। ফল ও শাক-সবজির অধিকাংশ প্যালেটই কাঠ দিয়ে তৈরি।

১.৪.৯ প্যাকেজিং এর আয়-ব্যয়ের হিসাব

পণ্য বাজারজাত করার একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে প্যাকেজিং। তবে এটা একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। কাজেই পণ্য-বাজারে নতুন নতুন প্যাকেজিং ব্যবস্থা আসতে থাকলে তা কাজে লাগানোর আগে অবশ্যই তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে নিতে হবে এবং হিসেব করে যদি দেখা যায় যে কোন একটা পণ্যের প্যাকেজিং খরচ পণ্যের বিক্রি দাম থেকে পাওয়া লভ্যাংশের চেয়ে বেশি হয় তা হলে তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কেবল সেই প্যাকেজিং ব্যবস্থাই গ্রহণযোগ্য হবে যা সত্যিকার অর্থে লাভজনক হবে।

বার বার ব্যবহার করা যায় এমন সব প্যাকেজিং আধারগুলোই সাধারণতঃ লাভজনক হয়। এ ধরনের প্যাকেজিং আধার আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই স্থানীয় বাজারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন- প্লাষ্টিক ক্রেট।

১.৪.১০ প্যাকেজিং এর পাত্রসমূহ

অনেক ধরনের প্যাকেজিং আধার/পাত্র আছে। নিচে ঢেউ খেলানো কার্ডবোর্ডের তৈরি চার ধরনের প্যাকেজিং পাত্রের চিত্র দেয়া হলো। এর মধ্যে 'ক' চিত্রে যে বাক্সটি দেখা যাচ্ছে সেটা ভাঁজ করে রাখা যায় ও সব চেয়ে সস্তা। 'খ' ও 'গ' চিত্রে দেখানো বাক্সগুলো শক্ত, এক সঙ্গে অনেকগুলো একটির ওপর আরেকটি তুলে গাদা করে রাখার বিশেষ উপযোগী কিন্তু দাম বেশি।

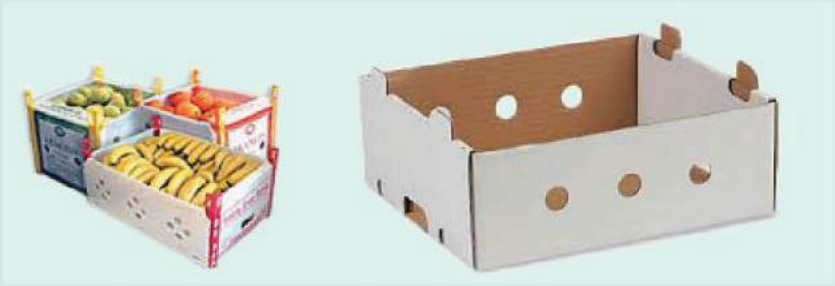

চিত্রঃ করোগেটেড কার্ডবোর্ডের প্যাকেজিং বাক্সের নমুনা

নিচের চিত্রে যে বাক্সটি দেখানো হয়েছে তাকে 'বিস বক্স' বলা হয়। এর কোনগুলো খুব শক্ত ও এগুলো ভাঁজ করে রাখা যায় না।

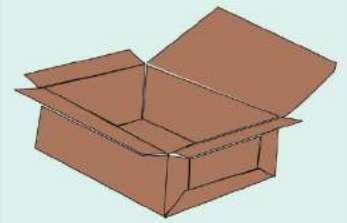

চিত্রঃ করোগেটেড কার্ডবোর্ডের প্যাকিং বাক্সের নমুনা (কলাপসিবোল নয়)

নিচের চিত্রে সচরাচর ব্যবহার করা হয় এমন আরও অনেক ধরনের প্যাকেজিং বাক্স দেখানো হলো। এগুলোর আকার, আকৃতি, উচ্চতা, ওজন সবই প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে তৈরি করে নেয়া যেতে পারে।

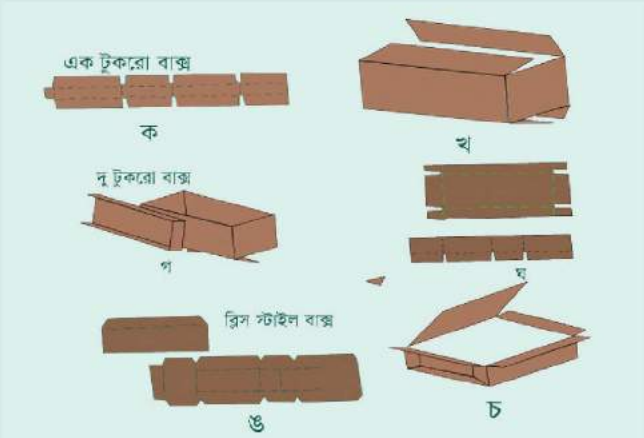

চিত্রঃ বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজিং বাক্সের নমুনা

প্যাকেজিং কাজ পরিচালনা:

যখন স্থানীয়ভাবে তৈরি বাক্সের গা অসমান খসখসে অথবা ধারালো হয় তখন ফাইবার বোর্ডের তৈরি কম দামের আস্তরণ বাক্সের ভেতরে বসিয়ে দেয়া যায়। এতে সংরক্ষিত পণ্যে আঘাতজনিত কোন ক্ষতের সৃষ্টি হবে না। বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত প্লাস্টিক ক্রেট ক্রমান্বয়ে প্যাকেজিং এর জগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

চিত্র: ফাইবার বোর্ডের প্যাকিং বাক্সের নমুনা

প্যাকেজিং প্রক্রিয়া:

যদি বড় ব্যাগ অথবা ঝুড়ি ফল ও শাক-সবজি প্যাকেজিং এর জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে নিচের চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে অবিকল একটি বাঁশের তৈরি টিউব ঝুড়ির মাঝে বসিয়ে দিলে ঝুড়ি/ ব্যাগের অভ্যন্তরে সৃষ্ট তাপ সহজেই বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

নিচে মরিচ ভর্তি একটি বাঁশের টিউবসহ ঝুড়ির চিত্র দেখানো হয়েছে।

চিত্র: চিমনিযুক্ত বড় প্যাকিং ঝুড়ি

১.৪.১১ প্যাকিং লাইন

প্যাকিং লাইন হতে পারে পুরোপুরিভাবে যান্ত্রিক বা কেবল মাত্র সাধারণ লম্বা বড় বড় টেবিল যার ওপর কিছু সংখ্যক শ্রমিক সকলে মিলে বিভিন্ন কাজ হাত দিয়ে সম্পন্ন করে। নিম্নলিখিত ছকে দু'ধরনের প্যাকিং লাইনের বিভিন্ন কাজগুলো কিভাবে সম্পন্ন হয় তার বর্ণনা পাশাপাশি দেয়া হলো:

কাজ	ছোট লাইন	যান্ত্রিক লাইন
একত্র করা	⇨ হাতের সাহায্যে ⇨ শুকনো গাদা ⇨ এলিভেটরে তোলা এবং পানির ট্যাংকে নামানো, ধোয়া, শুকানো, বাছাই, ছাঁটাই	⇨ যন্ত্রের সাহায্যে ⇨ পানিতে ঢুকানো এবং ডুবিয়ে গাদা করা ⇨ এলিভেটরে সাহায্যে পানির ট্যাংকে নেয়া, ধোয়া, শুকানো এবং মোমের-আবরণ দেয়া
বাছাই করা	⇨ হাতের সাহায্যে ⇨ বহনকারী বেল্টের সাহায্য প্রয়োজন ⇨ যথেষ্ট জায়গা ⇨ বহনকারী বেল্টের গতি নিয়ন্ত্রণ করা ⇨ ভালভাবে পণ্যসামগ্রী দেখা ⇨ শ্রমিকের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান ⇨ পর্যবেক্ষণ সম্পাদিত কাজ ⇨ পণ্যের যথাযথ তোলার অবস্থা ⇨ আকার ও রং চিহ্নিত করা	⇨ হাতের সাহায্যে ⇨ বহনকারী বেল্টের সাহায্য প্রয়োজন ⇨ যথেষ্ট জায়গা ⇨ বহনকারী বেল্টের গতি নিয়ন্ত্রণ করা ⇨ ভালভাবে পণ্যসামগ্রী দেখা ⇨ শ্রমিকের প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা প্রদান ⇨ পর্যবেক্ষণ সম্পাদিত কাজ ⇨ পণ্যের যথাযথ তোলার অবস্থা ⇨ আকার ও রং চিহ্নিত করা
শ্রেণী বিন্যাস	⇨ অপ্রয়োজনীয়/অগ্রহণযোগ্য পণ্য বাদ দেয়া এবং বাজারজাত করার উপযোগী পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস করা।	⇨ অপ্রয়োজনীয়/অগ্রহণযোগ্য পণ্য বাদ দেয়া এবং বাজারজাত করার উপযোগী পণ্যের বিভিন্ন শ্রেণী বিন্যাস করা।
সঠিক আকার/ আকৃতি নির্ধারণ	⇨ হাতের সাহায্যে ⇨ আকার নির্ধারক রিং এর সাহায্যে ⇨ দাড়ি পাল্লার সাহায্যে	⇨ যান্ত্রিক আকার, আকৃতি এবং ওজন নির্ধারকের সাহায্যে এখন এসব যন্ত্র প্রায় সব কম্পিউটারাইজড পণ্যের আকার নির্ধারণী উপকরণ প্যাকিং হাউসের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হতে হবে। ⇨ আকার নির্ধারণী উপকরণ সম্পূর্ণ সঠিকভাবে ফলের আকার অনুযায়ী পৃথক করার ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে যাতে তা প্যাকিং, বাজারজাত করার আইন সিদ্ধ নূন্যতম স্ট্যান্ডার্ড মেটাতে সক্ষম হয়। ⇨ আকার নির্ধারণী উপকরণ এমন ভাবে ফলের আকার অনুযায়ী পৃথক করবে যাতে প্যাক করা, বাজারজাত করার বেলায় ন্যূনতম মান বজায় থাকে।

মোমের প্রলেপ দেয়া		⇨ গায়ে কোন প্রকার ক্ষতের সৃষ্টি না করে/যন্ত্রের সাহায্যে ফল ও সবজির গায়ে খুব হালকা করে (ফুড-গ্রেডেড) প্রলেপ দেয়া। মোম, প্যারাফিনের আবরণ অথবা কখনও কখনও ছত্রাক নাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি লাগানো হয়।
প্যাকিং	⇨ হাতের সাহায্যে	⇨ হাতের সাহায্যে ⇨ যন্ত্রের সাহায্যে

চিত্রঃ সিলিং মেশিন

১.৪.১২ ফল ও সবজির পরিবহণ

চিত্রঃ প্যাকিং ও স্বল্প দূরত্বের পরিবহন

উৎপাদন স্থান থেকে টাট্‌কা ফল ও সবজি বাজারে নিয়ে আনা এবং ভোক্তাদের হাতে পৌঁছে দেয়ার কার্য সম্পাদনের আওতায় পরিবহণ অন্যতম। সারা বছর ধরে প্রচুর পরিমাণে টাট্‌কা ফল ও সবজি উৎপাদন হয় প্রধানত গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং অ-গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলবায়ুর দেশসমূহে অথচ বিশ্বে এ সব পণ্যের সবচেয়ে বেশি চাহিদা যে সব দেশে সেগুলো উৎপাদন অঞ্চলের অনেক দূরে অবস্থিত। কাজেই পরিবহণের গুরুত্ব সবসময়ই রয়েছে এবং তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে দূরবর্তী বাজারসমূহে বিভিন্ন পণ্য যথাসময়ে সুষ্ঠভাবে পৌঁছানোর ব্যাপারে নানা ধরনের জটিলতার সম্মূখীন হতে হচ্ছে। এসব পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য উন্নত কারিগরী দক্ষতা এবং কার্যকর ও সুষ্ঠু

গুদাম ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বেড়ে চলেছে।

এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এমন সব পণ্যের এবং যেসব পণ্য বিমানের মাধ্যমে বিদেশের বাজারে যাচ্ছে তাদের পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দ্রুত পঁচনশীল পণ্য দূরবর্তী স্থানে পরিবহণের কাজে ট্রেন ও সমুদ্রগামী জাহাজের ভূমিকা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি ব্যপক। তাই এখানে এ বিষয় খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে এবং কিছু সূত্রের উল্লেখ করা হবে। তবে বঙ্গোপসাগরের সাথে সরাসরি যোগসূত্র এবং একাধিক ভাল সমুদ্র বন্দর এবং অনেকগুলো ভাল অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর থাকায় এদেশেরও সমুদ্র পথে বিদেশে পণ্য প্রেরণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও দেশের অভ্যন্তরের বড় বাজারগুলোতে উৎপাদন এলাকা থেকে দ্রুত পঁচনশীল পণ্য প্রেরণের জন্য রেল পথের ব্যবহারও অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে করা যেতে পারে।

১.৪.১৩ ফল ও সবজি পরিবহণের উপায় এবং যন্ত্রপাতি

পণ্য পরিবহণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলো বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্রই কাজে লাগানো হয় উল্লিখিত পরিবহণ ব্যবস্থাদির সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

সড়ক পথে পরিবহণ	ঘরে ঘরে পৌঁছানো যায়, একবার মাত্র পণ্য বোঝাই এবং নামালেই চলে, কাজ দ্রুত সম্পাদন করা যায়। খারাপ রাস্তায় ঝাঁকুনির আঘাতে পণ্যের ক্ষতি হয়। এটি ব্যয়বহুল এবং প্রচুর শক্তি-ব্যয় সম্পন্ন।
রেল পথে পরিবহণ	ঝাঁকুনীবিহীন এবং তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় সাপেক্ষ, সব সময় কম গতি সম্পন্ন একাধিকবার উঠানো নামানোর প্রয়োজন হতে পারে।
অভ্যন্তরীণ নদী পথে পরিবহণযোগ্য নৌকা	সুবিধা এবং অসুবিধা রেল পথে পরিবহণের মতই। হিমাগার সুবিধা দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।
সমুদ্রগামী জাহাজে	খুব বড় আকারের দ্রুত পঁচনশীল পণ্যের রপ্তানি উপযোগী শিল্প থাকতে হবে। আমেরিকায় এ ধরনের শিল্প রয়েছে এবং কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশেও কলা, আলু, সাইট্রাস অথবা আপেল ইত্যাদির মত তুলনামূলকভাবে কম দ্রুত পঁচনশীল পণ্য রপ্তানিযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে এগুলো অতি দ্রুত পঁচনশীল পণ্যের জন্য উপযুক্ত নয় এবং এগুলো তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল।
উড়োজাহাজ	ব্যয়বহুল অথচ অতিদ্রুত পঁচনশীল পণ্যের রপ্তানি/অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এতে কম এবং বেশি উভয় পরিমাণ পণ্য সামগ্রীই বহন করা হয়। আকাশ পথে পরিবহণ কাজের সর্বস্তরে অত্যন্ত জোরালো সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একান্ত প্রয়োজন। ব্যয়বহুল: একাধিকবার উঠানো-নামানো এবং পরিবহণ ব্যবস্থার উভয় প্রান্তেই দক্ষ পণ্য আদান-প্রদান সংস্থার প্রয়োজন হতে পারে।

১.৪.১৪ বিশ্বব্যাপী পণ্য পরিবহণের মাধ্যম সমূহ:

আকাশ পথে পরিবহণযোগ্য কনটেইনার	আকাশ পথ এবং দূর পাল্লার রাস্তায় পরিবহণের জন্য।
আকাশ পথে পরিবহণযোগ্য প্যালেট	জাল দিয়ে ঘেরা (আকাশ পথ এবং দূর পাল্লার রাস্তায় পরিবহণের জন্য।)
দূর পাল্লার রাস্তায় পরিবহণযোগ্য ট্রেলারস	শুধুমাত্র দূর পাল্লার রাস্তায় পরিবহণের জন্য।
পিগিব্যাক ট্রেলারস	রেলপথ, দূর পাল্লার রাস্তা, এবং রোল অন/রোল অফ সমুদ্রগামী জাহাজে পরিবহণের জন্য।
ভ্যান কনটেইনারস	রেলপথ, দূর পাল্লার রাস্তা এবং সমুদ্রগামী জাহাজে উঠানো/ নামানোর উপযুক্ত ব্যবস্থাধীনে পরিবহণের জন্য।
সাধারণ সমুদ্রগামী মালবাহী জাহাজ	পণ্য হিমায়িত করার সুযোগ সুবিধাসহ, পরিবহণ যোগ্য কনটেইনার, প্যালেট করা পণ্য পরিবহণের জন্য।
রেল বক্সকারস	প্যালট করা অথবা পরিবহণযোগ্য কনটেইনারে নেয়ার জন্য।

বিভিন্ন পরিবহণ কোম্পানির কাছ থেকে আকাশ পথে পণ্য বহণকারী কনটেইনারের আকার, বহন ক্ষমতা ও ওজন এবং পণ্য হিমায়িত করা সংক্রান্ত সুবিধাদি সম্বন্ধীয় সকল সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

১.৪.১৫ পরিবহণ পথে পণ্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা/ সাধারণ ব্যবস্থাপনা

- ⇨ পণ্য সামগ্রীকে যতদূর সম্ভব ঠান্ডা রাখা (হিমায়িত ব্যবস্থার অভাবে, রাত্রি বেলায় পরিবহণ করা)।
- ⇨ পরিবহণকালে পণ্য সামগ্রী ভালভাবে ঢেকে রাখা এবং বাইরের আবহাওয়ার প্রভাব থেকে রক্ষা করা।
- ⇨ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারে নিয়ে যাওয়া।

১.৪.১৫.১ট্রাক চলাচল করার সময় যে প্রধান বিষয়গুলো সম্বন্ধে সদা সজাগ থাকা প্রয়োজন সেগুলো হলো:

- ⇨ ট্রাকে রক্ষিত মালপত্র
- ⇨ ট্রাকের সাস্পেনশন
- ⇨ খারাপ রাস্তা

১.৪.১৫.২ উন্নয়নশীল দেশে স্থলপথে পরিবহণ করলে পণ্যের যে ক্ষতি হয় তা অনেক সময় অত্যন্ত বেশি। এ জন্য যে দুটো প্রধান কারণ কাজ করে তা হলো:

- ⇨ পণ্যের গায়ে আঘাতজনিত ক্ষত।
- ⇨ পরিবহণের পণ্যের মাঝে অতিমাত্রায় তাপ সৃষ্টি।

১.৪.১৫.৩ উল্লেখিত আঘাতজনিত ক্ষত পরিহার করার জন্য যে সব পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন সেগুলো হলো:

- ⇨ মালপত্র পরিবহণ যানে উঠানো এবং নামানোর সময় যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা এবং এটা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা ভালভাবে তদারকি করা।
- ⇨ ২০-২৫ কেজি ওজনের প্যাকেজগুলো একজনের পরিবর্তে দু'জনে মিলে ওঠানো বা নামানো।

- ⇨ পচঁনশীল নয় এমন পণ্য সামগ্রী খুব আঁটসাট এবং শক্ত করে বাঁধা যাতে তা নড়াচড়া করতে না পারে এবং পরিবহণ যানের জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ⇨ প্যাকেজের ওজন যাতে সর্বদা সমান হয় সেদিকে খেয়াল রাখা।
- ⇨ মালপত্রের প্যাকেজগুলো এমনভাবে সাজানো যাতে নিচেরগুলো কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে উপরের গুলোকে ধরে রাখতে পারে।
- ⇨ পরিবাহিত পণ্য অত্যন্ত ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। পথিমধ্যে কোথাও পরিবহণ যান ভেঙ্গে পড়লে পুরো মালপত্রই সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- ⇨ গাড়ির চালককে অবশ্যই অত্যন্ত পারদর্শী হতে হবে বিশেষ করে খারাপ রাস্তায় গাড়ি চালানোর ব্যাপারে তাকে সদা সজাগ থাকতে হবে।
- ⇨ যখন নতুন পরিবহণ যান কেনা হয় তখন সেটাতে অবশ্যই 'এয়ার সাস্‌পেনশন' সংযোজিত থাকতে হবে। পুরাতন গাড়ির 'এ্যাক্সেল' গুলোতে 'এয়ার সাস্‌পেনশন' সংযোজন করে নিতে হবে। এ ব্যবস্থা নিলে দেখা গেছে পরিবহণকৃত ফলের আঘাতজনিক ক্ষতি শতকরা ৫০% কমে যায়।

১.৪.১৬ বিমানে পরিবহণ:

বাংলাদেশের রপ্তানিকারকগণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্য সামগ্রী বিমানযোগে ইংল্যান্ড এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রেরণ করেন। তবে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে শাক-সবজি, ফলমূল রপ্তানী করা হয়েছে ইতালি, কানাডা, আমেরিকায় (সূত্র: রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ২০১১)। এ সাহসী উদ্যোগ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভ-জনক হিসেবে চালু রাখতে হলে অবশ্যই এর প্রতিটি পদক্ষেপ অত্যন্ত সু-নিয়ন্ত্রিত এবং উন্নতমান সম্পন্ন ব্যবস্থাপনার আওতাধীনে পরিচালিত হতে হবে। বিমান ভাড়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সাধারণত এটা মোট উৎপাদন ও বাজারজাত করার খরচের প্রায় অর্ধেকের মত। এর প্যাকেজিং খরচও অত্যন্ত বেশি। এ কারণেই বিমানযোগে প্রেরিত পণ্য অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চমানের হতে হবে এবং ঐসব জাতের পণ্যই হতে হবে যেগুলোর চাহিদা আমদানিকারক দেশে প্রচুর রয়েছে যাতে ঐসব বাজারের প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

১.৪.১৬.১ বিমান বন্দরের কার্যক্রম:

বিমান ছেড়ে যাওয়ার নির্ধারিত সময়ের বহু পূর্বেই পণ্য বিমান বন্দরে এসে পৌছাতে হবে। বিমান বন্দরে এ সমস্ত পণ্য সামগ্রী রাখার মত হিমায়িত সুযোগ সুবিধা অবশ্যই থাকতে হবে। এখানে অত্যন্ত যত্নসহকারে এসব মালপত্র নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে পণ্য সামগ্রীতে কোন রকমের আঘাতজনিত ক্ষতের সৃষ্টি না হয়। এ সংক্রান্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অনেক আগেই তৈরি করে রাখতে হবে এবং প্রেরিত মালের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বাহ্নেই আমদানিকারককে ফ্যাক্স অথবা টেলিফোন করে জানিয়ে দিতে হবে।

১.৪.১৬.২ বিমানের কনটেইনার:

যাত্রী অথবা পণ্যবাহী যে বিমানই হোক না কেন, এতে একই ধরনের পণ্য নির্ধারিত কনটেইনার থাকে আবার পণ্য বোঝাই প্যাকেজগুলো গাদা করে নেয়ার ব্যবস্থাও থাকে। জাল দিয়ে মোড়ানো এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি 'প্যালেটস' প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। এগুলো অনেক সময় রপ্তানীকারকরা বিমান কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নেন এবং প্যাকিং হাউজে নিয়ে পণ্য সামগ্রী বোঝাই করে বিমান বন্দরে নিয়ে আসেন।

১.৪.১৬.৩ তাপ ও তাপমাত্রা:

যাত্রীদের কেবিনে যে তাপ ও তাপমাত্রা রক্ষা করা হয় ঠিক সেই একই পরিবেশে যাত্রীবাহী বিমানে প্রেরিত পণ্যও বহন করা হয়।

১.৪.১৭ তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব:

পণ্যে অতিমাত্রায় তাপ উৎপাদন পরিহার করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেয়া একান্ত প্রয়োজন:

- ⇨ কনটেইনারে/বাক্সে জীবন্ত কোষ সম্বলিত পণ্য বোঝাই থাকে বলে তাদের শ্বসন ও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং তা থেকে যথেষ্ট তাপের সৃষ্টি হয়। কাজেই এ তাপের প্রকোপ কমানোর জন্য এবং তাপজনিত কারণে পণ্যের ক্ষতিসাধন পরিহার করার জন্য ঐসব বাক্সে সুষ্ঠু বাতাস চলাচল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে পণ্যের গাদায়ও বাতাস চলাচলের যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শ্বসনজনিত তাপ ও গ্যাসের খারাপ প্রতিক্রিয়া থেকে পণ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়।
- ⇨ পণ্য পরিবহণ যানে ওঠানো-নামানোর জন্য যে সময়ের প্রয়োজন ঐ সময়কালে পণ্যে সূর্যের তাপ লাগা অত্যন্ত ক্ষতিকর। পণ্যের ১০ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে লাগানো সাদা রং করা একটা ছাদ তাপ প্রতিসরণে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- ⇨ খোলা ট্রাকের চারিদিকে একটা ফ্রেম তৈরি করে তার সাথে ক্যানভাস লাগিয়ে পুরো ট্রাকে কভার দিয়ে সূর্যের তাপ থেকে পণ্য রক্ষা করা যেতে পারে।

১.৪.১৭.১ হিমায়িত করার সুবিধা সম্বলিত পরিবহণ যান পণ্যে তাপ সৃষ্টি প্রতিহত করে

- ⇨ সকল উন্নত দেশে এবং অনেক উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের সুবিধা দ্রুত পঁচনশীল পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তা সে দূর পাল্লার রাস্তা, রেলপথ অথবা সমুদ্র পথে যেভাবেই হোক না কেন।

১.৪.১৭.২ তাপ নিয়ন্ত্রণ:

হিমায়িত সুবিধাযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থায় তাপ নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু যন্ত্রপাতি (অটোমেটিক থার্মোষ্ট্যাট, জমে যাওয়া বরফ গলানোর সুবিধা এবং ফ্যান) সংযোজিত থাকে।

১.৪.১৭.৩ ইনসুলেশন:

বাইরের তাপ যাতে এ সমস্ত কনটেইনারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য এর দেয়াল, মেঝে, দরজা, ছাদ সব তাপ অপরিবাহী বস্তু দিয়ে মোড়ানো হয়। সব সময় যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে এ ইনসুলেশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে না যায়।

১.৪.১৭.৪ বাতাস চলাচল সুবিধা:

এমনভাবে বাতাস চলাচল সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে যাতে বাইরের বাতাস পণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পায় এবং পণ্যে সৃষ্ট শ্বসনজনিত গ্যাস যেমন ইথিলিন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অন্যান্য গ্যাস এবং গন্ধ সহজেই বাইরে বের হয়ে যেতে পারে।

১.৪.১৮ টাট্‌কা পণ্যের কোল্ড চেইন মার্কেটিং

উন্নত দেশ সমূহে এ ব্যবস্থায় পণ্য বাজারজাত করা হয়। এ ব্যবস্থায় রয়েছে গাছ থেকে পণ্য পাড়া অথবা ক্ষেত থেকে তোলার পর পরই পরিমিত শীতল তাপমাত্রায় ঠান্ডা করা এবং বাজারজাত করা পর্যন্ত কার্যক্রম একই তাপমাত্রার আওতায় সম্পন্ন করার ব্যবস্থাকেই কোল্ড চেইন মার্কেটিং বলা হয়। এ ব্যবস্থা নিশ্চিত ভাবেই ব্যয়বহুল তবে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপীয় দেশ সমূহে টাট্‌কা পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে দীর্ঘ সময় ধরে বাজারজাত করা হচ্ছে। ফলে ভাল দামও পাওয়া যায় বলে এ ব্যবস্থাধীনে বাজারজাত করার ব্যয় পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হয়।

১.৫ বিভিন্ন ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল এবং এর গুরুত্ব

⇨ **কি জানা যাবে:** উদ্যান জাতীয় ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যাবে।

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসের জন্য মূল্যসংযোজন করে সংরক্ষণ; পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য।

শাক-সবজি ও ফলমূল দ্রুত পঁচনশীল। উত্তোলনের পরে শতকরা ৩০ থেকে ৪০ ভাগ ফসল সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। দ্রুত পঁচনশীল ফসলকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করলে ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায় এবং একইসাথে অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমানও কমানো যায়। শাক-সবজি ও ফলমূল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে বর্তমানে বাংলাদেশে অসংখ্য সমস্যা বিদ্যমান, তবে এ খাতকে ভিত্তি করে অনেক লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে।

১.৫.১ প্রক্রিয়াজাতকরণ (Processing) কি?

প্রক্রিয়াজাতকরণ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে ফল বা সবজির আকৃতি, প্রকৃতি, অবয়ব ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে ভৌত (Physical) ও রাসায়নিক (Chemical) পদ্ধতি অনুসরণ করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে প্রক্রিয়াজাতকরণ বলা হয়। যেমন: ফল ও সবজিকে শুকনো করে বা ঘন চিনি অথবা ঘন লবণের দ্রবণে বা তেলের মধ্যে শুকনা অবস্থায় ডুবিয়ে রেখে প্রক্রিয়াজাত করে জ্যাম, জেলী, চাটনি, আচার, চিপস, মোরব্বা করে দীর্ঘকাল সংরক্ষণ করা যায়। প্রক্রিয়াজাত করে সবজি ও ফল সংরক্ষণ করলে এদের গুনগত মানের কোন পরিবর্তন হয় না।

চিত্র: প্রক্রিয়াজাতকৃত বিভিন্ন ফল ও সবজি

১.৫.২ প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব:

ফলমূল ও শাক-সবজি আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের চাহিদাও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির প্রতিদিন ২৩০ গ্রাম সবজি ও ৫৬ গ্রাম ফল খাওয়া উচিত। তবে মাথাপিছু দৈনিক সবজি ও ফলের গড় প্রাপ্যতা যথাক্রমে ৭০-৮০ গ্রাম যা আমাদের চাহিদার মাত্র ৩০-৩৫ ভাগ পূরণ করে। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে প্রতি বছর উৎপাদন মৌসুমে প্রচুর শাক-সবজি বিশেষ করে ফল নষ্ট হয়ে যায়। আবার ফসলের সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা (Post Harvest Management) যেমন: আহরণের সময়, পরিবহণ পদ্ধতি, বাছাইকরণ, প্যাকেজিং প্রভৃতির অভাবে অপচয় বেশি হচ্ছে এবং গুণগত মানও কমে যাচ্ছে। শাক-সবজি ও ফলমূল যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে প্রক্রিয়াজাতকরণের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:

⇨ মৌসুমে শাক-সবজি ও ফলের প্রচুর উৎপাদন হয়। এ সময় ফসলের দাম কম থাকে। তাই সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করলে গড় মৌসুমের পরে বিক্রি করলে অধিক লাভবান

হওয়া যায়। যেমন: মৌসুমে আলুর দাম কম থাকে, সেজন্য কৃষক খাওয়ার আলু ও বিক্রির আলু ঘরে সংরক্ষণ করে থাকে। এ সময় যদি কিছু পরিমাণ আলু প্রক্রিয়াজাত করে রাখা যায় তাহলে পরে সে আলু গ্রামের গৃহিনী ও মেয়েরা বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। আলুর প্রক্রিয়াজাতকরণের অন্যতম উপায় চিপস, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইত্যাদি।

- ⇨ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আমাদের দেশে বেকার নারী ও পুরুষের সংখ্যাও বাড়ছে। খাদ্য বা শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে এই বিশাল বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থাণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। বিশেষ করে নারীরা ঘরে বসেই শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাত করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। এতে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ফলপ্রসূ হয়। তাই বেকারত্ব দূরীকরণে প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে ২৫% মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রী দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায় বিধায় সারাবছরই এসব খাদ্য সামগ্রী বাজারে পাওয়া যায়। সারাবছর পুষ্টি চাহিদা মেটাতে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।
- ⇨ বর্তমানে শাক-সবজি বা ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এসব যন্ত্র ব্যবহার করে খুব সহজেই খাদ্যসামগ্রী দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। তাই কৃষি খাতকে আধুনিক করতে প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন।
- ⇨ বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া ও জলবায়ু বিভিন্ন রকম হওয়ায় সব অঞ্চলে সব ধরণের ফসল ভালো জন্মায় না। যেমন: সিলেট অঞ্চলে সাতকড়া উৎপাদন ভালো হয়। তাই সাতকড়া প্রক্রিয়াজাত করে অন্যান্য অঞ্চলে সরবরাহ করা যায়। এছাড়া এক অঞ্চলের সবজি অন্য অঞ্চলে প্রক্রিয়াজাত করে সরবরাহ করলে শাক-সবজি ও ফলমূল পঁচে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকরণের ফলে শাক-সবজি ও ফলমূলের পুষ্টিমান অক্ষুন্ন থাকে। এছাড়া কিছু কিছু শাক-সবজি ও ফলমূলের পুষ্টিমান বৃদ্ধি পায়।
- ⇨ ফলমূল ও শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার তুলনামূলক কম হয়। আর যেসকল রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ঝুকিপূর্ণ নয়। তাই প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলমূল, শাক-সবজি তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রী দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। তাই বন্যা, ক্ষরা বা দুর্ভিক্ষের সময় প্রক্রিয়াজাতকৃত এসব খাদ্যসামগ্রী দুর্যোগপীড়িত মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
- ⇨ উন্নত দেশগুলোতে প্রক্রিয়াজাতকৃত শাক-সবজি ও ফলমূলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রক্রিয়াজাতকরণের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যেগুলো উন্নত দেশগুলোতে এসব প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বা রপ্তানী করছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানী করে ৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয় যা ২০০৯-২০১০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। এসব প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মধ্যে রয়েছে ফলের জুস, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি। তাই প্রক্রিয়াজাতকরণ খাতকে ব্যবহার করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

সুতরাং জাতীয় ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কৃষি কর্মকান্ডের উন্নয়নের জন্য সবজি ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ প্রযুক্তিসমূহ ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম। স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প পরিসরে এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

১.৫.৩ প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সমূহ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল এর আইএফএসটি এবং অন্যান্যভাবে উদ্ভাবিত গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতিসমূহকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণী বিভাগ করা যায়:

ক) চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ
খ) আচার, চাটনী এবং সস তৈরি করে সংরক্ষণ
গ) জুস বা স্কোয়াশ তৈরি করে ফলের রস সংরক্ষণ
ঘ) স্টীপিং পদ্ধতি বা লবণের দ্রবণে সবুজ ফল সংরক্ষণ
ঙ) ফল ও সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ
চ) শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতক (Zero Energy Evaporative Cooler)

১.৫.৩.১ চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ:

চিনি ও এসিড সংযোজন করে জেলী, জ্যাম, মোরব্বা ও ক্যান্ডি তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা হয়। প্রস্তুতকৃত এসব খাদ্য খুবই মুখরোচক ও পুষ্টিকর। রুটি, পাউরুটি ইত্যাদি তন্ডুল জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে এসব প্রক্রিয়াজাত খাদ্য মিশ্রনে খাবারের স্বাদ আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুখরোচক হয়। প্রক্রিয়াজাতকৃত এসব খাদ্যকে বেশ সুগন্ধযুক্ত ও দর্শনীয় করার জন্য অনেক রকম খাদ্য রঙ ও সুগন্ধী মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু রঙ ও সুগন্ধীর কোন খাদ্য মূল্য নেই। সুতরাং ফল ও সবজি থেকে প্রস্তুত জ্যাম, জেলী, মোরব্বা ও ক্যান্ডিতে স্বাভাবিক ফলের রস থাকা বাঞ্চনীয়। কোন কৃত্রিম দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। তবে কিছু কিছু ফল বা সবজির গন্ধ বিশেষ সুগন্ধী মিশিয়ে দূর করা হয়। যেমন: মিষ্টি কুমড়া বা লাউয়ের জ্যামে কেওড়া এসেন্স, পেঁপে ও গাজরের জ্যামে গোলাপের সুগন্ধী মিশিয়ে প্রস্তুত খাদ্যকে কেওড়া বা গোলাপের সুগন্ধী করা হয়।

১.৫.৩.২ জেলী: জেলী তৈরী করার সময় ফলের রস ব্যবহার করা হয়। বেশী মিহি চালনী বা কাপড়ে ফলের শাঁসকে ছেঁকে নেয়া হয় বলে ফলের আঁশ বাদ পড়ে যায়। এজন্য প্রস্তুত জেলী বেশ পরিষ্কার ও অর্ধ স্বচ্ছ দেখায়। ফল ও সবজিতে অবস্থিত পেকটিন চিনির উপস্থিতিতে রস অথবা পাল্পকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। যে সমস্ত ফলে পেকটিনের পরিমাণ বেশী যেমন পেয়ারা সেগুলোতে পেকটিন যোগ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত পেয়ারা, আম, আনারস, আপেল, পেঁপে ইত্যাদি থেকে জেলী তৈরী করা হয়।

১.৫.৩.৩ জ্যাম: জ্যাম তৈরি করার সময় ফলের পাল্প ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ফল থেকেই জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। যে সকল ফল বা সবজিতে পেকটিন কম সে ক্ষেত্রে ফলের পাল্পের সাথে কিছু পরিমাণ পেকটিন (০.৪-০.৫%) মিশিয়ে নিতে হয়। কম পেকটিন যুক্ত ফলের পাল্পের সাথে বেশী পেকটিনযুক্ত ফলের পাল্প মিশিয়ে মিশ্র ফলের জ্যাম তৈরি করা যায়। সাধারণত আম, আনারস,

কমলালেবু, তাল, মাল্টা, গাজর, কুমড়া ইত্যাদি ফল ও সবজি থেকে জ্যাম তৈরি হয়। জেলী ও জ্যাম প্রস্তুতের সময় পেকটিন ছাড়াও সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস ফল/সবজির রসের সাথে মিশিয়ে নেয়া হয়। মোটামুটিভাবে ১০০ গ্রাম লেবুর রসে যে পরিমাণ সাইট্রিক এসিড আছে তা ৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিডের সমান। সাইট্রিক এসিড মিশ্রণে ৩টি কাজ হয়- ক) ফলের শাঁস থেকে পেকটিন মুক্ত করে, খ) খাদ্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায় ও গ) বেশী মিষ্টি মিশ্রিত খাদ্যের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

১.৫.৩.৪ মোরব্বা: ফল অথবা সবজির টুকরা দীর্ঘ সময় চিনির সিরায় ডুবিয়ে পরে সিরা নিংড়িয়ে মোরব্বা তৈরি করা হয়। মোরব্বা তৈরি করার সময় ফল অথবা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমিয়ে চিনির পরিমান বাড়িয়ে প্রায় শুকনো অবস্থায় এনে সংরক্ষণ করা যায়। এটি জ্যামের মত তবে তাতে ফল বা সবজির আকৃতি বজায় থাকে। আম, বেল, আনারস, চালকুমড়া, শশা ইত্যাদি ফল ও সবজি থেকে মোরব্বা তৈরী করা হয়।

১.৫.৪ আচার, চাটনী এবং সস তৈরি করে সংরক্ষণ:

১.৫.৪.১ আচার: রকমারি মশলা মেশানো ফল বা সবজিকে খাওয়ার তেল, ভিনেগার ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে আচার বলা হয়। আচারে প্রায় শুকনা করা ফল বা সবজির সঙ্গে সরিষার তেল এবং ভিনেগার মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ফল বা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমে গিয়ে (১২% বা কম) তেল বা ভিনেগার সম্পৃক্ত হয়ে উঠলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায় অর্থাৎ পঁচন সৃষ্টিকারী জীবানুগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আচার তৈরিতে মশলা হিসেবে সরিষা, আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, মেঁথি, কালজিরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টকমিষ্টি করার জন্য চিনি এবং অ্যাসেটিক এসিড অথবা ভিনেগার ব্যবহার করা হয়। তন্ডুল জাতীয় খাদ্য যেমন: ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা ইত্যাদির সংঙ্গে অল্প পরিমাণ আচার মিশ্রনে খাদ্যকে বেশ মুখরোচক করে তোলে। আচারে ব্যবহৃত সরিষার তেল ও এসিড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত কাঁচা আম, আমড়া, জলপাই, চালতা, গাজর, রসুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, সাতকড়া ইত্যাদি থেকে আচার তৈরি করা হয়।

১.৫.৪.২ চাটনী: সাধারণত ফলের পাল্পের সাথে লবণ ও চিনি মিশিয়ে চাটনী তৈরী করা হয়। বিভিন্ন মশলা মিশিয়ে চাটনী স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়ানো যায়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য চাটনীতে সোডিয়াম বেনজোয়েট (০.৬%) মেশানো হয়। ভাত, রুটি, লুচি ইত্যাদি তন্ডুল জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে অল্প পরিমাণ চাটনী মিশিয়ে খেতে ভাল লাগে। চাটনী অন্যান্য খাদ্যকে বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তোলে। বরই, তেঁতুল, জলপাই, আম, আমড়া ইত্যাদি থেকে চাটনী তৈরি করা হয়।

১.৫.৪.৩ কেচাপ বা সস্: ফল ও সবজির ঘন শাঁসালো রস বা পাল্পের সঙ্গে বেশী মাত্রায় চিনি, ভিনেগার ও মশলা মিশিয়ে যে খাদ্য প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয় সেই খাদ্যকে সস্ বা কেচাপ বলে। কেচাপ তৈরির সময়ে ফল বা সবজির পাল্প ব্যবহার করা হয়। কেচাপ বা সস্ে অ্যাসেটিক এসিড বা ভিনেগার মিশ্রিত থাকায় এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়াও প্রিজারভেটিভ হিসেবে কেচাপ বা সস্ে সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহার করা হয়। এ খাদ্যগুলো বেশ মুখরোচক। রুটি, পাউরুটি, ঘি বা তেলে ভাজা খাদ্যদ্রবের সঙ্গে অল্প পরিমাণ সস্ বা কেচাপ মিশিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে। সাধারণত পাকা টমেটো, পাকা তেতুঁল, কাঁচা আম ইত্যাদি থেকে সস্ বা কেচাপ তৈরি করা হয়।

১.৫.৫ জুস বা স্কোয়াশ তৈরি করে ফলের রস সংরক্ষণ:

বিভিন্ন প্রকার ফলের রস নিস্কাশন করে স্কোয়াশ, নেকটার বা জুস হিসেবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

১.৫.৫.১ স্কোয়াশ : ফলের রসের সাথে চিনি, পানি, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ সংযোজন করে স্কোয়াশ তৈরি করা যায়। স্কোয়াশে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় খাওয়ার পূর্বে পানি মিশিয়ে নিতে হয়।

১.৫.৫.২ নেক্টার/ জুস: ফলের রসের সাথে চিনি, পানি, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ মিশিয়ে নেক্টার/জুস তৈরি করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। খাওয়ার সময় নেক্টার বা জুসে পানি মেশানো প্রয়োজন পড়ে না।

১.৫.৬ স্টীপিং পদ্ধতি বা লবণের দ্রবণে সবুজ ফল সংরক্ষণ :

কোন সংরক্ষক দ্রবণে ফল-সবজি ডুবিয়ে রেখে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বলা হয়। গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড, পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (কে এম এস) ও লবণ নির্দিষ্ট অনুপাতে পানিতে মিশিয়ে সংরক্ষক দ্রবণ তৈরি করা হয়। কাঁচা আম, জলপাই, আমড়া, আমলকি ফল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৯-১২ মাস কাল পর্যন্ত স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ফলসমূহ পরবর্তীতে আচার, চাট্নি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের মাধ্যমে কৃষক মূল্যবান ফলের অপচয় রোধের পথ খুঁজে পাবেন।

১.৫.৭ ফল ও সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ :

সৌর ড্রায়ার ও খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি: বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। ফলমূল ও শাক-সবজি দ্রুত পঁচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য। প্রতি বছর এদেশে উৎপাদিত ফলমূল ও শাক-সবজির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিভিন্ন কারণে পচে নষ্ট হয়। সংরক্ষণের মাধ্যমে এ অপচয়ের আংশিক রোধ করা সম্ভব। সংরক্ষণ একটি সহজ পদ্ধতি। সৌর তাপে শুকানো বলতে সৌর ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকানোকে বুঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে রোদে খোলা অবস্থায় কাঁচা আম, কুল, আমসত্ব, মরিচ ইত্যাদি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। খোলা রোদে শুকানো পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং শুকানো খাদ্যদ্রব্য নিম্নলিখিত উপায়ে দূষিত হতে পারে:

- ⇨ খাদ্যদ্রব্য সহজেই কীটপতঙ্গ ও জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়।
- ⇨ বায়ুবাহিত ধুলাবালি খাদ্যদ্রব্য দূষিত করে।
- ⇨ পশুপাখির সংস্পর্শে আসার কারণে খাদ্যদ্রব্য সহজেই দূষিত হয়।
- ⇨ ঢেকে না রাখলে হঠাৎ বৃষ্টি এলে খাদ্যদ্রব্য ভিজে যায়।
- ⇨ উন্নতমানের শুকনো খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পাওয়া যায় না।
- ⇨ ফলে খোলা অবস্থায় রোদে শুকানো দূষিত খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয়।

১.৫.৮ শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতক (Zero Energy Evaporative Cooler) :

পানি বাষ্পে পরিণত হবার সময় চারপাশের পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে ফলে ঐ পরিবেশটি ঠান্ডা হয় এবং পরিবেশের আর্দ্রতাও বেড়ে যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে বাষ্পীভবনজাত শীতক তার মধ্যে রক্ষিত পণ্যের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়। এই শীতকের তাপমাত্রা বায়ুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কাছাকাছি বজায় থাকে এবং তাপমাত্রার উঠানামা খুব কম হয়। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আর্দ্রতা যখন যথাক্রমে ৩৯.১ ডিগ্রী সে., ২৪.২ ডিগ্রী সে. এবং ৩৬% ও ৯% তখন শীতকের ক্ষেত্রে হবে যথাক্রমে ২৫.২ ডিগ্রী সে. ২৩ ডিগ্রী সে. এবং ৯৭% ও ৯৪%। সস্তা ও দেশজ দ্রব্যাদি দিয়ে খুব সহজেই এধরনের শীতক তৈরি করা সম্ভব। এই শীতক ব্যবহার করে পণ্যাদির জীবনকাল বেশ কয়েকদিন বাড়ানো যেতে পারে।

উদ্দেশ্য

- ফল, সবজি ও এদের থেকে উৎপাদিত খাদ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যের স্বল্পকালীন সংরক্ষণের জন্যে একটি শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতক (Zero energy evaporative cooler)-এর গ্রামীণ পর্যায়ে প্রচলন।
- শূণ্যশক্তি ব্যবহারকারী বাষ্পীভবনজাত শীতক এর মধ্যে রাখার মাধ্যমে ফল, সবজি ও এদের থেকে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য, অন্যান্য পণ্যাদির আয়ুষ্কাল বাড়ানো।
- পণ্যের তরতাজাভাব এবং আদি স্বাদ গুণাগুণ বজায় রাখা।
- পচনশীল কৃষিজ পণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো।

১.৬ সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন ও দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

⇨ **কি জানা যাবে:** দলভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, সাপ্লাই চেইন ও ভ্যালু চেইন সম্পর্কে জানা যাবে।

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য সরবরাহ ও উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পেতে।

১.৬.১ Supply Chain:

Supply Chain এমন একটি ধারাবাহিক কার্যপদ্ধতি যার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ উপায়ে উৎপাদন স্থান থেকে ক্রেতা বা ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায়।

১.৬.১.১ Supply Chain এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

উৎপাদিত পণ্য যত কম linkage এর মাধ্যমে কৃষকের নিকট থেকে ক্রেতা বা ভোক্তার নিকট পৌঁছানো যায়।

১.৬.১.২ Supply Chain এর কাজ:

⇨ ক্রেতা বা ভোক্তার সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি অর্জন।
⇨ জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।
⇨ সঠিক চাহিদা পূরণ।
⇨ পণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।
⇨ পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ রাখা।

১.৬.১.৩ Supply Chain জড়িত উপাদান সমূহ:

Supply Chain জড়িত উপাদান সমূহ নিম্নরুপ:

⇨ সরবরাহকারী
⇨ উৎপাদনকারী
⇨ দোকান/গুদাম/পণ্যগার
⇨ বন্টনকারী প্রতিষ্ঠান
⇨ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
⇨ ক্রেতা বা ভোক্তা

১.৬.১.৪ Supply Chain মডেল:

১.৬.১.৫ কৃষিজ পণ্যের Supply Chain প্রচলিত মডেল:

কৃষিজ পণ্যের প্রচলিত Supply Chain মডেল নিম্নরূপ:

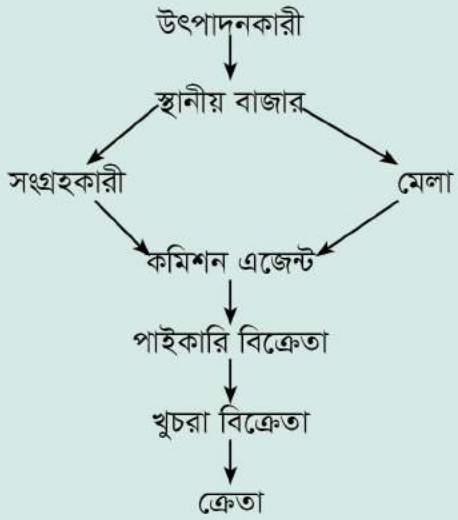

১.৬.১.৬ প্রয়োগিক Supply Chain:

ঝিনাইদহ জেলার শীতকালীন যেসব শাক-সবজি উৎপাদিত হয় তা স্থানীয়, জেলা ও বিভাগীয় বাজারের যেসব ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ভোক্তার নিকট পৌছায় তার একটি বাস্তব চিত্র নিচে দেওয়া হলো:

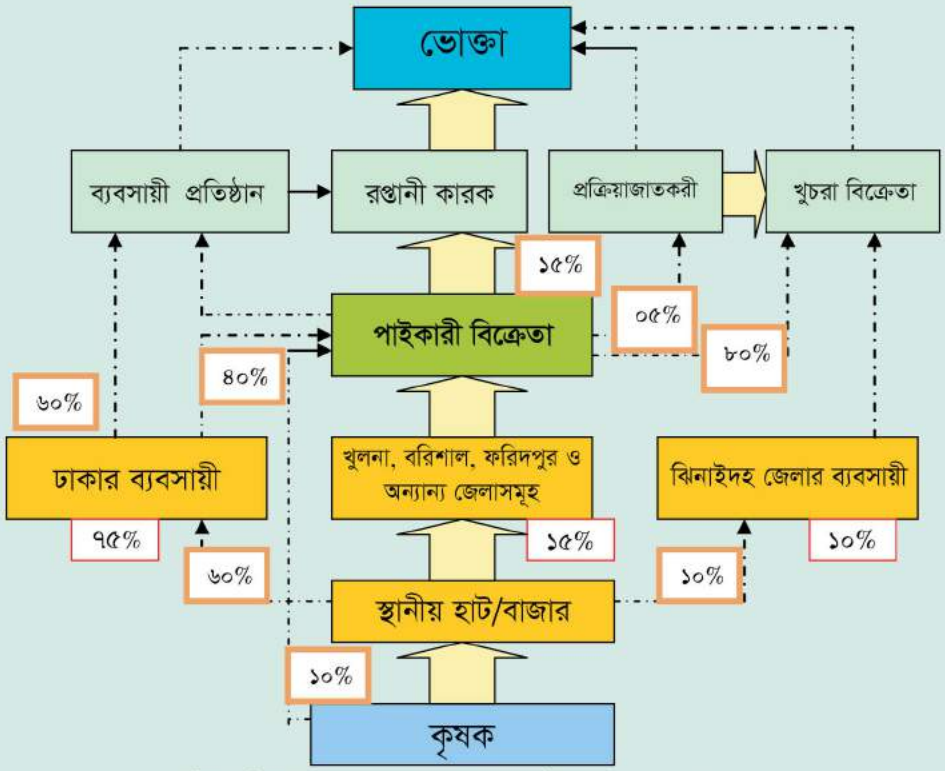

চিত্র: ঝিনাইদহ জেলার শাক-সবজির Supply Chain.

১.৬.১.৭ Supply Chain ব্যবস্থাপনা :

Supply Chain ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নোক্ত বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:

- ⇨ পণ্যের গুনগত ও পরিমাণগত মান নিয়ন্ত্রণ করা।
- ⇨ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা (সড়ক, নদী, রেল পথে)
- ⇨ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা।
- ⇨ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।

১.৬.১.৮ Supply Chain উন্নয়নে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার ভূমিকা :

Supply Chain উন্নয়নে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ কৃষক গরিব এবং অশিক্ষিত। তারা জানেনা কিভাবে পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণ করতে হয়। এই সুবিধা কাজে লাগিয়ে কিছু মধ্যস্বত্ব ভোগী (Midleman) অধিক লাভের আশায় কৃষকদের কাছ থেকে স্বল্প দামে পণ্য ক্রয় করে শহরের বিভিন্ন বাজারে অধিক দামে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে। এর ফলে আমাদের কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং মধ্যস্বত্ব ভোগীগণ (Midleman) লাভবান হয়। কৃষি বিপণন কর্মকর্তা হিসাবে কৃষকদের উপরোক্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার বিষয়সমূহ অবহিত করতে হবে। এছাড়া দেশে সুপার মার্কেট-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করে কৃষকের পণ্য সরাসরি ক্রেতাদের নিকট বিক্রির নিশ্চিয়তা প্রদান করতে হবে।

১.৬.২ Value Chain:

Value Chain আধুনিক ব্যবসা কৌশলের একটি ধারাবাহিক কার্যপদ্ধতি। যেখানে কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদন পর্যন্ত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের স্বীয় ব্যবসায়িক নীতির কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু মূল্য সংযোজন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল Stakeholder-ই লাভবান হয়। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন মোট খরচের বিপরীতে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা।

১.৬.২.১ Value Chain এর উদ্দেশ্য:

Value Chain এর উদ্দেশ্য সমূহ নিম্নরূপ:

- ⇨ পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজির উন্নত করা।
- ⇨ Stakeholder-দের মধ্যে টেকসই সম্পর্ক স্থাপন করা।
- ⇨ চুক্তি ভিত্তিক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি করা।
- ⇨ দ্রব্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা।
- ⇨ জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা।
- ⇨ কর্পোরেট ব্যবসার উন্নতি করা।
- ⇨ উৎপাদন ও পরিবহণ খরচ হ্রাস করা।
- ⇨ পোস্ট হারভেস্ট ক্ষতি হ্রাস করা।

১.৬.২.২ Value Chain জড়িত বিভিন্ন Stakeholder :

একটি কার্যকরী Value চেইন প্রতিষ্ঠায় জড়িত বিভিন্ন Stakeholder সমূহ নিম্নরূপ:

- ⇨ বাণিজ্যিক কৃষি বিপণন প্রতিষ্ঠান

- ⇨ বাজার (পাইকারি ও খুচরা বাজার)
- ⇨ উপকরণ সরবরাহকারী (বীজ, সার, মেশিনারী)
- ⇨ কারিগরী সহায়তা প্রদান (সম্প্রসারণ ও গবেষণা)
- ⇨ আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান)
- ⇨ সরবরাহকারী (পাইকারি ও সুপার মার্কেট)
- ⇨ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
- ⇨ কৃষক বা কৃষক গ্রুপ
- ⇨ রপ্তানীকারক
- ⇨ আমদানিকারক
- ⇨ এনজিও

১.৬.২.৩ Value Chain ও কার্যক্রম:

ভ্যালু চেইন মডেল হচ্ছে সেই চেইন মডেল যেখানে ফসল উৎপাদনে প্রতিটি স্থানে মূল্য সংযোজিত চেইন। এই মূল্য সংযোজন স্থান এবং ফসল ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। নিম্নে বৃহত্তর ঝিনাদহ জেলার ঢেঁড়স এর বাস্তবিক ভ্যালু চেইন দেওয়া হলো।

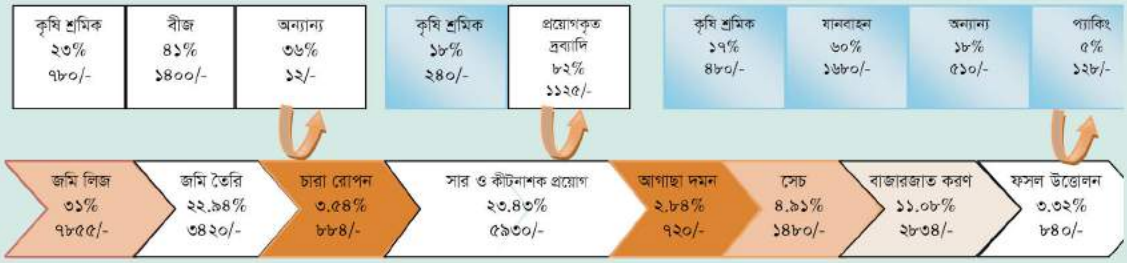

উৎপাদন ব্যয় (প্রতি হেক্টর) = টাকা ২৫,৩০৮.০০ (টাকা ৩.২০ কেজি)
মোট বিক্রয় মূল্য (প্রতি হেক্টর) = টাকা ৩৯,৫০০.০০ (টাকা ৫.০০ কেজি)
নেট লাভ/ মুনাফা = টাকা ১৪,১৯২.০০

বাজার মূল্য (টাকা/কেজি)
উৎপাদন এলাকা = ৫.০০
ট্রেড = ৬.৭০
পাইকারী মূল্য = ১০.০০
খুচরা মূল্য =১৪.৫০

চিত্রঃ ঢেঁড়স এর ভ্যালু চেইন।

১.৬.২.৪ Value Chain-এ Stakeholder-দের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর:

Value Chain-এ Stakeholder-দের মধ্যে আধুনিক ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্যবস্থায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সরাসরি কৃষকগ্রুপ এবং অন্যান্য Stakeholder-দের বিভিন্নরকম কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এতে অংশগ্রহণকারী সকল Stakeholder লাভবান হয় এবং নিজেদের মধ্যে আরো নিবিড় সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

কার্যক্রমটি নিম্নরূপ:

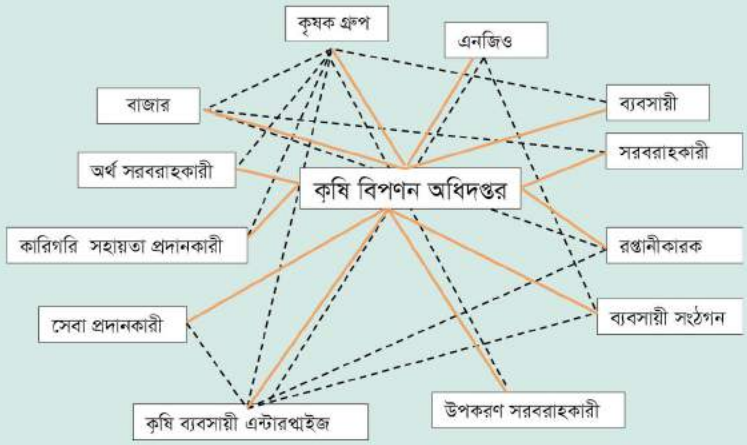

[এখানে -------- দূর্বল সম্পর্ক, এখানে ——— শক্তিশালী সম্পর্ক]

চিত্র: Value Chain-এ Stakeholder-দের মধ্যে নিবিড় শক্তিশালী সম্পর্ক স্থাপনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

১.৬.২.৫ Value Chain- প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন মডেল ও তার কার্যক্রম পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভূমিকা:

আধুনিক শক্তিশালী Value Chain- প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন মডেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সব মডেল গুলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় এনে মডেলে অংশগ্রহণকারী সকল Stakeholder-দেরকে আর্থিক, কারিগরী ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে Value Chain-কে শক্তিশালী করে নিজেদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এ মডেলে অংশগ্রহণকারী সকল Stakeholder লাভবান হবে। মডেল গুলো হলো:

- ⇨ কৃষক-বাজার সম্পর্কের মডেল
- ⇨ কৃষক-এন্টারপ্রাইজ চুক্তি মডেল
- ⇨ বৃহৎ ব্যক্তিগত এন্টারপ্রাইজ মডেল
- ⇨ এন্টারপ্রাইজ বাজার সম্পর্কের মডেল
- ⇨ সুপার মার্কেট Supply Chain মডেল

নিম্নে মডেল গুলোর চিত্র দেয়া হলো:

কৃষক- বাজার সম্পর্কের মডেল

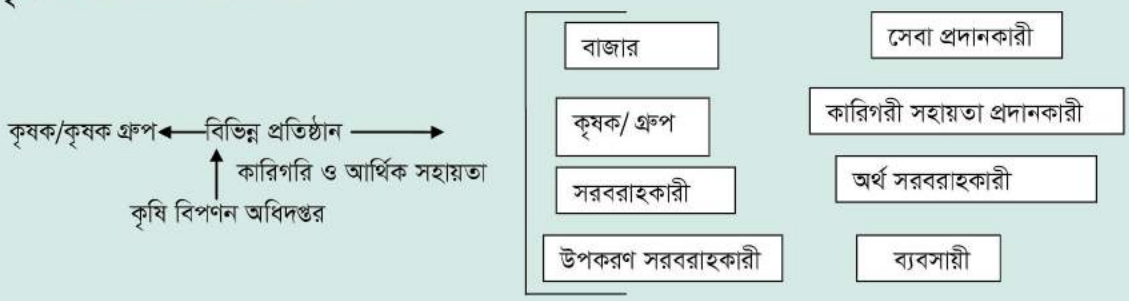

চিত্র: কৃষক-বাজার সম্পর্কের মডেল

কৃষক-এন্টারপ্রাইজ চুক্তি মডেল:

চিত্র: কৃষক-এন্টারপ্রাইজ চুক্তি মডেল

বৃহৎ ব্যক্তিগত এন্টারপ্রাইজ মডেল:

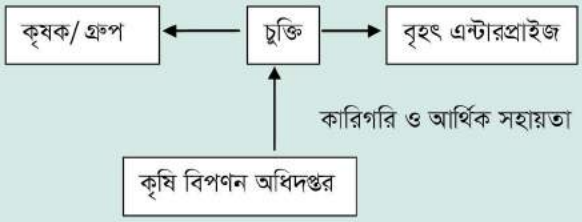

চিত্র: বৃহৎ ব্যক্তিগত এন্টারপ্রাইজ চুক্তি মডেল

এন্টারপ্রাইজ বাজার সম্পর্কের মডেল:

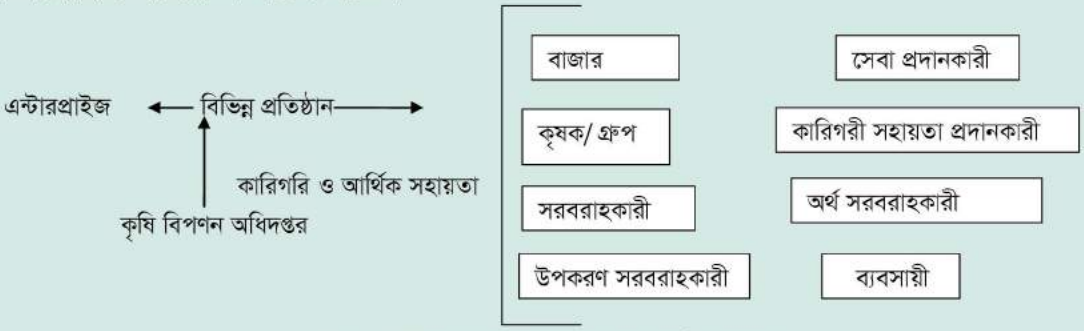

চিত্র: এন্টারপ্রাইজ বাজার সম্পর্কের মডেল

সুপার মার্কেট Supply Chain মডেল:

চিত্র: **সুপার মার্কেট Supply Chain** মডেল

১.৬.৩ Value Chain উন্নয়নে কৃষি বিপণন কর্মকর্তার করণীয়:

আমাদের দেশে মোট উৎপাদিত উদ্যানজাতীয় কৃষিজ পণ্যের ৩০-৪০% ক্ষতি হয় ফসল কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনার অভাবে। তাই কৃষি বিপণন কর্মকর্তা হিসাবে কৃষকদের এবং এতদসম্পর্কিত বিভিন্নস্তরের জনবলকে পোস্ট হারভেষ্ট অপারেশন (ফসল কাটা, ফসল মাড়াই, ফসল পরিস্কার, ফসল বাছাইকরণ ইত্যাদি) সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিয়ে এবং তাদের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে Value Chain সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে Value Chain এর উন্নয়ন সম্ভব। পোস্ট হারভেষ্ট অপারেশন সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ফলে স্টেকহোল্ডারগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধা পায়:

- ⇨ পোস্ট হারভেষ্ট ক্ষতি কমে যায়।
- ⇨ দ্রব্যের সংরক্ষণ কাল বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন বাড়ে।
- ⇨ দ্রব্যের দাম ও চাহিদা বাড়ে।
- ⇨ রোগ কম হয়।

১.৬.৪ ভ্যালু চেইন উন্নয়নে বাধাসমূহ:

- ⇨ উৎপাদনকারীসহ সকল বিভাগে কারিগরী (ফসলের রোগ-পোকা সংক্রমণ ব্যবস্থাপনা, সংগ্রহোত্তর কৌশল) জ্ঞানের অভাব।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কম হওয়ায় তাদের কাছ থেকে উৎপাদনকারীরা ফসলের মূল্য কম পায়।
- ⇨ ফসল সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের পাইকারি বিক্রেতাগণের মধ্যে ও সরবরাহের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান, যারফলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীগণ প্রতারণার শিকার হন।
- ⇨ ফসলের জন্য সুষ্ঠু কাঠামোগত বাজার নেটওয়ার্ক এবং বাজার তথ্য ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় উৎপাদনকারীগণ স্থানীয় বাজারের দাম অনুসারেই পাইকারের নিকট বিক্রি করতে বাধ্য হয়।
- ⇨ উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সীমিত।
- ⇨ ফসলের উন্নয়নে নিয়মিত সেবা না পাওয়া ও গুণগতমান সম্পন্ন উপকরণের (বিশেষ করে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক) স্বল্পতা এবং বেশি মূল্য এবং উপকরণের ভেজালের কারণে একদিকে উৎপাদন কমে যায় এবং অন্যদিকে উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়।

১.৬.৫ ভ্যালু চেইন উন্নয়নের কৌশল:

- ⇨ উৎপাদনকারীদের মানবিক ও প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতাসহ কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন।
- ⇨ সেবা ও উপকরণ প্রাপ্তি ও এর গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং গুণগতমানের উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ।
- ⇨ ক্ষুদ্র অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, প্রাইভেট কোম্পানি থেকে উৎপাদনকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আর্থিক সেবা প্রাপ্তি বৃদ্ধিকরণ।
- ⇨ ফসলের ব্যবসার জন্য ভৌত অবকাঠামোগত (কালেকশন সেন্টার, কালেকশন পয়েন্ট) ও সংগ্রহের ক্ষতি কমানোর জন্য ভৌত সুবিধাদির (প্যাকেজিং প্রযুক্তি) সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ⇨ সুষ্ঠ বাজার পদ্ধতি ও বাজার তথ্য প্রবাহ নিয়মিতকরণ।

১.৬.৬ কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনায় কৃষক দলের ভুমিকা:

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বেশি। এ দেশে এখনও কৃষিতে বাণিজ্যিকীকরণ সেভাবে ঘটেনি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কৃষি পণ্য উৎপাদন করে। কৃষক নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে খুব সামাণ্য পরিমান পণ্যই বিক্রয় করতে পারে। অন্যদিকে তাদের পণ্য ক্রয় করে বড় ব্যবসায়ী বা মিল মালিকগণ। ফলে পণ্যের দর কষাকষিতে ব্যবসায়ীরা সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে পক্ষান্তরে কৃষকের অবস্থা সুবিধাজনক থাকে না। ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া ক্রয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে কমমূল্যে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে। বড় ব্যবসায়ী বা মিল মালিকদের এই একচেটিয়া প্রভাব হতে মুক্তির জন্য কৃষকদের উচিত তাদের উৎপাদিত পণ্য দলগতভাবে বা সমবায় ভিত্তিতে বাজারজাত করা। কৃষকদের দ্বারা গঠিত এ ধরণের দল বা সংগঠনই হলো কৃষি বাজারজাতকরণ। এ ধরণের সংগঠন যে সবসময় একটা বিধিবদ্ধ (Formal) সংগঠন হবে তা নয় বরং একটা সাধারণ লক্ষ্য যেমন: পণ্যের ভাল মূল্য পাবার জন্য একই এলাকার কিছু কৃষক একত্রিত হয়ে তাদের উৎপাদিত পণ্য কোন একটা বাজারে নিয়ে বিক্রয় করতে পারে, তবে ফসল সংগ্রহ, পণ্যের গ্রেডিং, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এসব বিষয়ে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাছাড়া প্রয়োজনে এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। অতএব আমরা বলতে পারি কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রি করার জন্য এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্য স্বল্প মূল্যে ক্রয় করার নিমিত্তে গঠিত সংগঠনই হলো কৃষি বাজারজাতকরণ সমিতি। বাংলাদেশে দুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে গঠিত বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ ও পাট চাষী সমিতি হচ্ছে এ জাতীয় কৃষক সংগঠন। এটা কৃষকদেরকে তাদের পণ্যের জন্য দরকষাকষি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কৃষি উৎপাদনের এবং বিপণনের পরিকল্পনা করতেও কৃষকদেরকে সহায়তা করে। এ ধরনের সংগঠন তৈরী করা অনেকটা সহজ। এতে কোন বিধিবদ্ধ বা আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকেনা। কিছুসংখ্যক কৃষক একত্রিত হয়ে নিজ উদ্যোগে এ জাতীয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারে। এ জাতীয় সংগঠন গড়া, পরিচালনা করা এবং গুটিয়ে ফেলাও সহজ। আমাদের দেশের সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রধানত উৎপাদন কাজে ও কৃষি ঋণ বিতরণে সমবায় অধিক সাফল্য লাভ করেছে এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ সমবায় আন্দোলন তেমন সফল হতে পারেনি।

১.৬.৬.১ কৃষকদল গঠনের উদ্দেশ্য:

সাধারণত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কৃষক দল গড়ে উঠে।

- ⇨ কৃষকের আয়বৃদ্ধি করা।
- ⇨ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপণন উপযোগী কৃষি পণ্যকে একটা বড় আকারে বিপণন করা।
- ⇨ কৃষকদের দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- ⇨ ঋণ সুবিধা গ্রহণ করা।

একটি কৃষক সংগঠনের সফলতা নির্ভর করে যে সমস্ত বিষয়ের উপর সেগুলো হলো:

- ⇨ নিজেদের চাহিদার প্রেক্ষিতে স্বপ্রনোদিতভাবে দল বা সংগঠন গড়ে তোলা।
- ⇨ দলের বা সংগঠনের দায়িত্ববোধ, আনুগত্য এবং পারস্পরিক আস্থাবোধ থাকতে হবে।

⇨ ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে আঞ্চলিক অথবা টার্মিনাল মার্কেটের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে দেয়া।

কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনার কৃষক দল যে সমস্ত উপকার পায় তা হলো:

কৃষক সমবায় সমিতি বা কৃষক দল গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুনাফার জন্য কাজ না করে সংগঠিত উপায়ে বিপণনের মাধ্যমে সদস্যদের আয় বৃদ্ধি করে তাদেরকে বড় বড় ব্যবসায়ীদের শোষণ থেকে রক্ষা করা। মালিকানার ভিন্নতা ছাড়া সমবায় সমিতির সাথে অন্যান্য খুচরা ব্যবসায়ের তেমন কোন অমিল নেই। সাধারণত ক্ষুদ্র কৃষকরা নিজেদের সুবিধার জন্য সমবায়ের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। কৃষক দল গঠনের সুবিধা সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো:

(১) উপযুক্তমূল্য নিশ্চিতকরণ (Ensuring fair price): ব্যবসায়ীরা কৃষকদেরকে প্রায়ই তাদের পণ্যের উপযুক্ত মূল্য থেকে বঞ্চিত করে। কৃষকরা অসংগঠিত থাকে বিধায় তাদের শোষণ করা বিত্তশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়। ব্যবসায়ীরা গুণাগুণের কোন বাছ-বিচার না করেই সব রকমের পণ্যের জন্য একই মূল্য প্রদান করে থাকে। ফলে উত্তম মানবিশিষ্ট পণ্যের বিক্রেতারা সঠিক মূল্য পায় না এবং তাদের পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিশ্চিত করতে পারে না।

(২) উন্নতমানের গ্রেড প্রবর্তন (Introducing improved grade): উন্নতমানের গ্রেড প্রবর্তন ও উন্নয়নে সমবায় সমিতি যথেষ্ট সহায়তা করে। সমিতি প্রতিষ্ঠা করে কৃষি পন্য উৎপাদনকারী গণ মোড়কীকরণেও আধুনিকতার ছোঁয়া আনতে পারে। কৃষিপণ্যের মান-নির্ধারিত হলে এবং মোড়কীকরণে আধুনিকতার ছাপ থাকলে বাজারজাতকরণে অনেক সুবিধা হয়। কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের জন্য ভাল মূল্য পায়। পণ্যের উচ্চ মূল্য কৃষকদেরকে উন্নতমানের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করে যা তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। ব্যক্তিগতভাবে কৃষকদের পক্ষে পণ্যের মান-নির্ধারণ ও পর্যায়িতকরণ সম্ভব হয় না। একমাত্র সমবায় সমিতির মাধ্যমেই তারা এ কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

(৩) সুসংগঠিত বিপণন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা (Orderly marketing and stabilisation of prices): বৃহৎ সমিতিগুলো সুসংগঠিত ও নিয়মিত বিপণনের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সচেষ্ট থাকে। এইউদ্দেশ্যে সমিতিগুলো অনেক সময় বাজারে চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মপন্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পায়। সর্বাপেক্ষা উপযোগী সময়ে সর্বোত্তম বাজারে পণ্যের বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য তারা শস্যের বিপণন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। সমবায় সমিতি পণ্যের মৌসুমী প্রবাহের উপরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। এসব ব্যবস্থার ফলে বাজারে পণ্যের আধিক্য বা ঘাটতিমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে না। ফলে মূল্য স্থিতিশীল থাকে।

(৪) ব্যবসায়ীর অসাধুতা হ্রাস (Reduction of trade abuses): কৃষিজাত পণ্য বিপণনে অনেক প্রকার অসাধু ব্যবসায়ী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনকারীগণ অসংঘবদ্ধ থাকার ফলে অনেক রকম অব্যবস্থার উদ্ভব হয়। প্রায়ই কৃষক-বিক্রেতাকে নানারুপ বে-আইনী চাঁদা ও কর্তন প্রদান করতে হয়। এসব বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। কৃষকদের সমবায় সমিতি

প্রতিষ্ঠা করে এসব ব্যবসায়িক রীতিনীতি বিরুদ্ধ কার্যাবলী বন্ধ করা যায় এবং কৃষকদেরকে লোভী ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়।

(৫) বিপণন ব্যয় হ্রাস (Reduction of marketing cost): সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রাথমিক মধ্যস্বত্ব ভোগী ব্যবসায়ীদের পরিহার করে কৃষকগণ সরাসরি পাইকারী বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে পারে। সমবায় সমিতি থাকলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্য যোগাড়কারীদের পরিবর্তে কৃষকরা নিজেরাই সমিতির মাধ্যমে পণ্য জোগাড় করতে পারে এবং নিস্প্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে সক্ষম হয়। প্রাইভেট মধ্যস্থকারীদের তুলনায় কম খরচে সমবায় সমিতি বিপণন সেবা প্রদান করতে পারে। ফলে মধ্যস্থকারীদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে বিপণন ব্যয়ও হ্রাস পায়।

(৬) যৌথ দর কষাকষির সুবিধা (Advantages of collective bargaining power): কৃষি সমবায় সমিতি সমূহ কৃষিজাত পণ্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম বলে ক্রেতাদের সাথে কার্যকরীভাবে পণ্যের বিক্রয় মূল্য দিয়ে দর কষাকষি করতে পারে। যৌথ দর কষাকষির ফলে তাদের অবস্থান যেমন সুদৃঢ় হয়, তেমনি কৃষকদের পণ্যের উচ্চ মূল্য নিশ্চিত হয়।

(৭) সহজ ঋণ (Cheaper finance): ব্যক্তিগত কৃষকদের পক্ষে ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পাওয়া খুব সহজ নয়। ঋণ পেতে হলে তাদেরকে অনেক বাধ্যবাধকতা পালন করতে হয়। কিন্তু সমবায় প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা থাকে বলে সহজ শর্তে ও কম সুদের হারে ঋণ প্রদান করে। এতে সামগ্রীকভাবে কৃষক-সদস্যরাই উপকৃত হয়।

(৮) উন্নত বিক্রয় পদ্ধতি (Better selling methods): ফলমূল, শাক-সবজি ও অন্যান্য অ-প্রধান পণ্যের ব্যবসায় জড়িত সমবায় সমিতি তাদের পণ্যের বিক্রয় প্রসার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। ব্র্যান্ড নামের বিজ্ঞাপন প্রচার ও অন্যান্য কলাকৌশলের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার বাড়ানোর জন্য সমিতি সর্বদাই সচেষ্ট থাকে।

১.৬.৭ কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনার কিছু মডেল:

কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সংস্থার আওতায় সম্প্রতিকালে বেশ কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায়ের ভিত্তিতে সমিতি বা সংগঠন (গ্রুপ) গঠনপূর্বক বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ দানের মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদনমূখী কার্যক্রম বেশী এবং সংরক্ষণ ও বিপণনের অন্যান্য শাখায় যেমন: প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, গ্রেডিং, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর কার্যক্রম খুব সীমিত।

১.৬.৭.১ শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প:

১৯৮০ এর দশকে ''বাংলাদেশ-সুইস কৃষি প্রকল্প'' (BASWAP) -এর আওতায় শস্য সংরক্ষণের জন্য যে ঋণদান কর্মসূচী সীমিত আকারে চালু হয়েছিল সেটি আজ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণদান কর্মসূচী নামে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের দরিদ্র চাষীদের শস্য কর্তনের মৌসুমে তাদের উৎপাদিত ফসল নগদ টাকার তাৎক্ষনিক চাহিদার কারণে যে কোন মূল্যে বাজারে বিক্রি করে

দিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে ঐ কৃষকই আবার তাদের চাহিদা পূরনের জন্য বাজার থেকে উচ্চমূল্যে শস্য ক্রয় করে আর্থিক ক্ষতির সম্মূখীন হন। এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দেশের কতিপয় অঞ্চলে দরিদ্র চাষীদের, উৎপাদিত শস্যের সহায়ক মূল্য (Price Support) প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশ ও সুইস সরকারের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে এ প্রকল্পের কার্যক্রম পঞ্চগড় জেলায় শুরু হয়। উক্ত পরীক্ষামূলক প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পর ঐ একই মডেলে "শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্পটি (শগঋপ)" ১৯৯২ সনে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে শুরু হয়ে এখনও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ১৩টি, খুলনা বিভাগে ৪টি এবং বরিশাল বিভাগে ৫টি জেলাসহ মোট ৩৫টি জেলায় ৮২টি উপজেলাধীন ১০৭টি ইউনিয়নে এর ১১৬টি গুদাম আছে। ৮১৭টি গ্রামের ৮৭,৮৪৮টি কৃষক পরিবারকে এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়। প্রতিটি গুদামের আওতায় কমপক্ষে ৪০টি কৃষক গ্রুপ বা সংগঠন আছে। এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো শস্য কর্তন মৌসুমে কমদামে কৃষকের পণ্য বিক্রির হাত থেকে রক্ষার জন্য শস্য সংরক্ষণের বিপরীতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান। এই প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গুদামগুলো এবং এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে ঐ গ্রুপগুলোর উপর। এতে ঐ গ্রুপগুলোর তথা কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতি যেমন সাধিত হয় অপরদিকে তাঁদের বিপণন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২০০৫ পর্যন্ত মোট ৫৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় শুধু মাত্র দানাদার ফসল যেমন: ধান, গম, ডাল, তেলবীজ জাতীয় শস্য অন্তর্ভূক্ত।

১.৬.৭.২ শস্য বহুমূখীকরণ প্রকল্প (CDP):

কৃষি মন্ত্রনালয়ের আরেকটি প্রকল্প শস্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচীর মাধ্যমে দলগতভাবে ক্ষুদ্রাকারে কিছু কিছু পণ্য প্রক্রিয়াজাত পূর্বক বাজারজাতকরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল এবং এর আওতায় দেশের ৮টি জেলায় ১৬টি দল গঠন করে ঐ সমস্ত দলকে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতের প্রশিক্ষণ দিয়ে কার্যক্রম চালু করা হয়েছিল। তাছাড়া স্বল্পমূল্যের সংরক্ষনাগার তৈরী করে গৃহপর্যায়ে আলুসংরক্ষনের প্রশিক্ষণ ও সংরক্ষনাগার তৈরীতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্তির পরও ঐ সমস্ত দল এবং ব্যবসা চালু আছে।

১.৬.৭.৩ উত্তর-পশ্চিম শস্য বৈচিত্রকরণ প্রকল্প (NCDP):

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা যেমন: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং এলজিইডি, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং কয়েকটি এনজিওর সমন্বয়ে উত্তর-পশ্চিম শস্য বৈচিত্রকরণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। এই প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ১৬ (ষোল) টি জেলার কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের প্রচলিত পদ্ধতির বিপণন ব্যবস্থার পরিবর্তে একটি বিকল্প ও দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষক সংগঠন বা গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল এবং ঐ সমস্ত গ্রুপগুলোর কেন্দ্রীয়ভাবে একটি ফেডারেশন গঠন করা হয়েছিল। কিছু উচ্চমূল্য ফসল বিশেষ করে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপাদন ও বিপণন এবং হাট-বাজারের অবকাঠামোগত ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন চালু করা হয়েছিল।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল:

কৃষকের কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং গ্রামাঞ্চলে দলগত বিপণন ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়া। ক্ষুদ্র কৃষকদল (SFG) তথা কৃষকের ফসল বিক্রয়ের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের বিক্রিয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ফসলকে বড় আকারে বিক্রয়যোগ্য করা। দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। হাট-বাজারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা। মোট ৩০০০ টি দল গঠন করা হয়েছিল প্রতিটি কৃষক দল থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে নূন্যতম ২০ জন সদস্যের কৃষক বিপণন দল (FMG) গঠন করা হয়েছিল। এভাবে ৫০০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছিল। এ সমস্ত কৃষক বিপণন দল নিয়ে উপজেলা ভিত্তিতে একটি করে ক্ষুদ্র কৃষক বিপণন ফেডারেশন (SFMG) গঠন করা হয়েছিল, যে সংগঠন উপজেলা পর্যায়ে এ সমস্ত দলের বিপণন কার্যক্রম তদারকি করত। তাছাড়া ঢাকায় গাবতলীতে সর্বাধুনিক সুবিধাসম্বলিত একটি তিনতলা সেন্ট্রালমার্কেট নির্মান করা হয়েছে। গ্রোয়ার্স মার্কেট এবং পাইকারী বাসার সমূহের কৃষক বিপণনদল তাদের উৎপাদিত পন্য সরাসরি ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে বিক্রির ব্যবস্থা করছে।

১.৬.৭.৪ সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প:

বর্তমানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে চারটি সংস্থা যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয়ে "সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায়" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শাক-সবজি ফলমূল সঠিকভাবে সংগ্রহ কৌশল, শাক-সবজি ফলমূলের কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে গৃহপর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করা এবং সারা বছর পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং রপ্তানীকারকদের মধ্যে টেকসই সম্পর্ক স্থাপন করা এই প্রকল্পের বিপণন অংগের মূখ্য উদ্দেশ্য। এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সমন্বয়ে ১২টি জেলায় মোট ১৩,০০০ কৃষকের সমন্বয়ে মোট ৬৫০টি স্বপ্রনোদিত মার্কেটিং দল গঠন করা হয়েছে। গঠিত দলসমূহকে সংগ্রহ কৌশল, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নরসিংদী, কুমিলা, খুলনা ও রংপুরে ৪টি অফিস কাম-প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে উদ্যান ফসলের প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

বিদ্যমান মার্কেটিং চ্যানেল

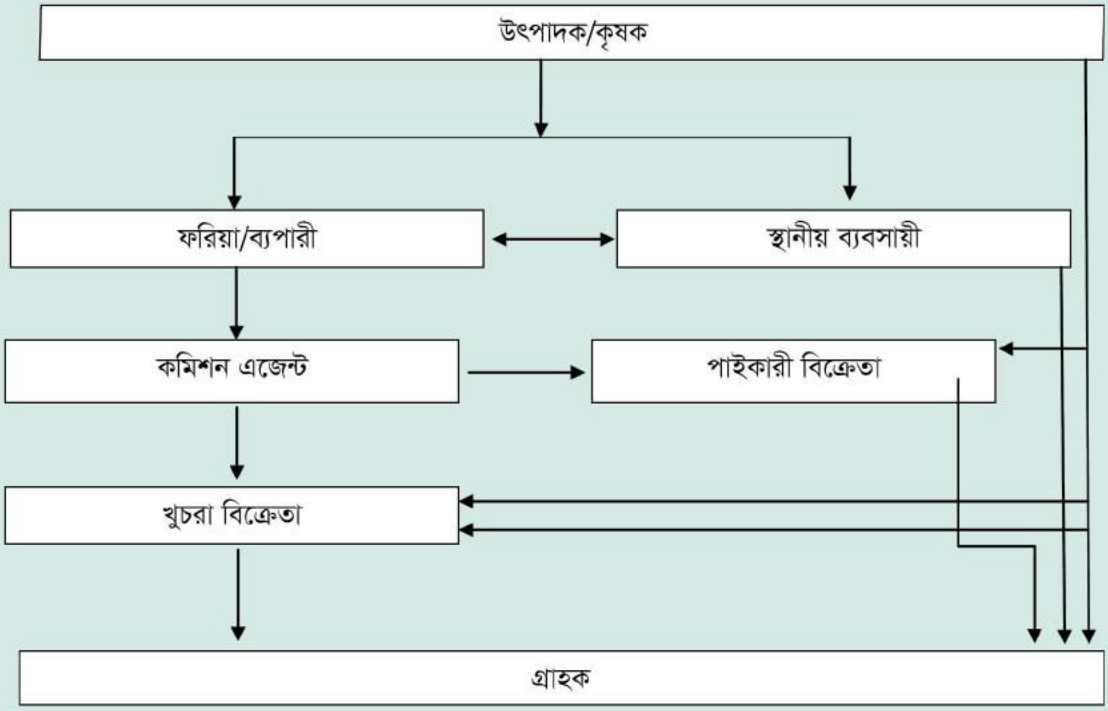

কৃষক বিপণন দলের মার্কেটিং চ্যানেল

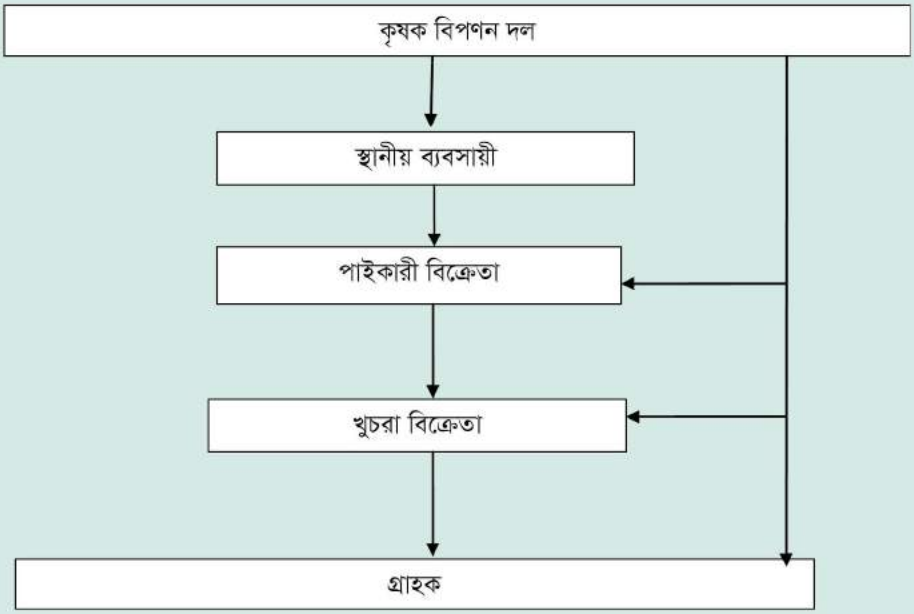

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রশিক্ষণ সূচি-২য় ভাগ

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষকের নাম
০৯.০০-৯.৩০	রেজিষ্ট্রেশন ও উদ্বোধন	
৯.৩০-১০.৩০	ফল ও সবজি'র বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সমূহ	
১০.৩০- ১০.৫০	চা বিরতি	
১০.৫০-১২.৫০	তাত্ত্বিক ও প্রাথমিক প্রস্তুতি **চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণঃ** ❖ টমেটোর জেলী/পেয়ারার জেলী/ আনারসের জেলী/আনারসের জ্যাম **অথবা আচার, চাটনী এবং সস্ তৈরী করে সংরক্ষণঃ** ❖ আমের আচার/ আমড়ার আচার/জলপাই এর আচার/চালতার আচার/ বেগুনের টকমিষ্টি আচার/ রসুনের আচার / জলপাই এর মিষ্টি চাটনী / চালতার মিষ্টি চাটনী/ বরই-তেঁতুলে টকমিষ্টি চাটনী /টমেটো কেচাপ **অথবা- জুস বা স্কোয়াশ তৈরী করে ফলের রস সংরক্ষণঃ** ❖ আনারসের স্কোয়াশ/ আমের নেক্টার/আমের জুস **অথবা- চিপ্স তৈরী করে সংরক্ষণঃ** ❖ কলার চিপ্স /আলুর চিপ্স ও আলুর ফ্রেন্চ ফ্রাই ❖ **চিনির সিরা অথবা লবণের দ্রবনে সংরক্ষণ** । ❖ **ফল ও সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ।** ❖ **খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ।**	
১২.৫০-১.৫০	**নামাজ ও মধ্যাহ্ন ভোজ বিরতি**	
০১.৫০-৪.৩০	ব্যবহারিক	
০৪.৩০-৫.০০	সমাপনী	

২.১ ফল ও সবজির প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি ও গুরুত্ব

⇨ **কি জানা যাবে:** সেকেন্ডারী প্রসেসিং এর পদ্ধতিসমূহ হাতেকলমে শেখার সুযোগ

⇨ **কেন জানা প্রয়োজন:** ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতি হ্রাসে মূল্যসংযোজন করে সংরক্ষণ, পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সম্পর্কে জানতে।

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আমাদের পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় পুষ্টি ব্যতীত কেউ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে না। পুষ্টি উপাদানের জন্য শাক-সবজি ও ফলমূলের গুরুত্ব অপরিসীম। যেসব রকমারি ফল ও সবজি আমরা খেয়ে থাকি তা কেবল আমাদের রসনার তৃপ্তি দেয় না, আমাদের দেহে ঠিকমত পুষ্টি উপাদান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শাক-সবজি ও ফলমূল আমাদের সুষম খাবারের একটি অংশ। সুতরাং এগুলো বাদ দিলে খাবার সুষম হবে না।

ফলমূল ও শাক-সবজি আমাদের শরীরের পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রধান উৎস। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে মৌসুমী ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। কিন্তু যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাবে বেশীর ভাগই নষ্ট হয়। ফলে কৃষক তার এ ধরণের ফলমূল বিক্রয়ের মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়।

এ দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। প্রায় ৯০% লোক ভিটামিন 'সি' শুণ্যতায় ভোগে। ভিটামিন-সি শরীরে রোগ প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে ও দেহের শক্তি বাড়ায়। কাজেই ভিটামিন-সি এর অভাব দূর করার জন্য ফলমূল ও শাক-সবজি পরিমান মত খাওয়া প্রয়োজন। ক্ষেত থেকে ফলমূল ও শাক-সবজি সংগ্রহ করার পর ধীরে ধীরে এর পঁচন শুরু হয়। কাজেই এ পঁচন রোধ করার একমাত্র উপায় প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাবার তৈরী করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা। এ ছাড়া এ ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার বাজারে ভোক্তাদের নিকট সরবরাহ করে মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

সহজ পদ্ধতিতে দেশীয় কাঁচামাল যেমন: মৌসুমী ফলমূল ও শাক-সবজি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন: জ্যাম-জেলী, সস, আচার, চাটনী তৈরী করে সংরক্ষণ করা এবং এ ধরনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিসহ দেশে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষ্যে প্রক্রিয়াজাত করণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণ মৌসুমী ফলমূল, শাক-সব্জি উৎপন্ন হয়।

আম, জাম, আনারস, লিচু, কামরাঙ্গা, কাঁঠাল, বেল, বাঙ্গী, তরমুজ, জলপাই, চালতা, আমলকী, কলা, বড়ই, তেঁতুল, সাতকরা ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাছাড়া

পটল, ঝিংগা, বরবটি, ঢেঁড়স, করলা, টমেটো, কুমড়া, শশা, সীম, গাজর, শালগম, লাউ, মটরশুটি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বেগুন ইত্যাদি প্রচুর পরিমানে জন্মে।

২.১.১ চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ:

চিত্রঃ- চিনির সিরায় লিচু

চিনি ও এসিড সংযোজন করে জেলী, জ্যাম, মোরব্বা ও ক্যান্ডি তৈরি করে বিভিন্ন ধরনের ফল ও সবজি সংরক্ষণ করা যায়। প্রস্তুতকৃত এসব খাদ্য খুবই মুখরোচক ও পুষ্টিকর। রুটি, পাউরুটি ইত্যাদি তন্দুল জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে এসব প্রক্রিয়াজাত খাদ্য মিশ্রণে খাবারের স্বাদ আরও বৃদ্ধি পায় এবং মুখরোচক হয়। প্রক্রিয়াজাতকৃত এইসব খাদ্যকে বেশ সুগন্ধযুক্ত ও দর্শনীয় করার জন্য বিভিন্ন রকম খাদ্য রঙ ও এসেন্স মিশ্রিত করা হয়। কিন্তু রঙ ও এসেন্সের কোন খাদ্য গুণ নেই। সুতরাং ফল ও সবজি থেকে প্রস্তুতকৃত জ্যাম, জেলী, মোরব্বা ও ক্যান্ডিতে স্বাভাবিক ফলের রস থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন কৃত্রিম দ্রব্য ব্যবহার না করাই ভাল। তবে কিছু কিছু ফল বা সবজির গন্ধ বিশেষ এসেন্স মিশিয়ে সুগন্ধযুক্ত করা হয় যেমন- মিষ্টি কুমড়া বা লাউয়ের জ্যামে কেওড়া এসেন্স, পেঁপে ও গাজরের জ্যামে রোজ এসেন্স মিশিয়ে প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে কেওড়া বা গোলাপের সুগন্ধীযুক্ত করা হয়।

২.১.১.১ জেলী:

জেলী তৈরী করার সময় ফলের রস ব্যবহার করা হয়। বেশী মিহি চালনী বা কাপড়ে ফলের শাঁসকে ছেঁকে নেয়া হয় বলে ফলের আঁশ বাদ পড়ে যায়। এজন্য প্রস্তুতকৃত জেলী বেশ পরিষ্কার ও অর্ধ স্বচ্ছ দেখায়। ফল ও সবজিতে অবস্থিত পেকটিন চিনির উপস্থিতিতে রস অথবা পাল্পকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। যে সমস্ত ফলে পেকটিনের পরিমাণ বেশী যেমন: পেয়ারা সেগুলোতে পেকটিন যোগ করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত পেয়ারা, আম, আনারস, কমলা, আমড়া ইত্যাদি থেকে জেলী তৈরী করা হয়।

২.১.১.২ জ্যাম:

জ্যাম তৈরি করার সময় ফলের পাল্প ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ ফল থেকেই জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। যে সকল ফল বা সবজিতে পেকটিন কম সে ক্ষেত্রে ফলের পাল্পের সাথে কিছু পরিমাণ পেকটিন (০.৪-০.৫%) মিশিয়ে নিতে হয়। কম পেকটিন যুক্ত ফলের পাল্পের সাথে বেশী পেকটিনযুক্ত ফলের পাল্প মিশিয়ে মিশ্র ফলের জ্যাম তৈরি করা যায়। সাধারণত আম, আনারস, কমলালেবু, তাল, মাল্টা, পেঁপে, গাজর ইত্যাদি ফল ও সবজি থেকে জ্যাম তৈরি হয়। জেলী ও জ্যাম প্রস্তুতের সময় পেকটিন ছাড়াও সাইট্রিক এসিড বা লেবুর রস ফল/সবজির রসের সাথে মিশিয়ে নেয়া হয়। মোটামুটিভাবে ১০০ গ্রাম লেবুর রসে ৫ গ্রাম সাইট্রিক এসিড থাকে।

সাইট্রিক এসিড মিশ্রণে ৩টি কাজ হয়-

ক) ফলের শাঁস থেকে পেকটিন মুক্ত করে।

খ) খাদ্যের সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

গ) জ্যাম, জেলী জাতীয় খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করে।

২.১.১.৩ মোরব্বা:

ফল অথবা সবজির টুকরা দীর্ঘ সময় চিনির সিরায় ডুবিয়ে পরে সিরা নিংড়িয়ে মোরব্বা তৈরি করা হয়। মোরব্বা তৈরি করার সময় ফল অথবা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমিয়ে চিনির পরিমাণ বাড়িয়ে প্রায় শুকনো অবস্থায় এনে সংরক্ষণ করা যায়। এটি জ্যামের মত তবে এতে ফল বা সবজির আকৃতি বজায় থাকে। আম, বেল, চালকুমড়া, আনারস, শশা ইত্যাদি ফল ও সবজি থেকে মোরব্বা তৈরী করা হয়।

২.১.২ আচার, চাটনী এবং সস তৈরি করে সংরক্ষণ:

২.১.২.১ আচার:

রকমারি মশলা মেশানো ফল বা সবজি খাওয়ার তেল, ভিনেগার, চিনি ইত্যাদি মিশ্রিত অবস্থায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে আচার বলা হয়। আচারে প্রায় শুকনা করা ফল বা সবজির সঙ্গে সরিষার তেল এবং ভিনেগার মিশিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ফল বা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমে গিয়ে (১২% বা কম) তেল বা ভিনেগার সম্পৃক্ত হয়ে উঠলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায় অর্থাৎ পঁচন সৃষ্টিকারী জীবানুগুলোর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আচার তৈরিতে মশলা হিসেবে সরিষা, আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, মেথি, কালজিরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া টকমিষ্টি করার জন্য চিনি এবং অ্যাসেটিক এসিড অথবা ভিনেগার ব্যবহার করা হয়। তন্দুল জাতীয় খাদ্য যেমন- ভাত, রুটি, লুচি, পরোটা ইত্যাদির সঙ্গে অল্প পরিমাণ আচার মিশ্রণে খাদ্যকে বেশ মুখরোচক করে তোলে। আচারে ব্যবহৃত সরিষার তেল ও এসিড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে। সাধারণত কাঁচা আম, আমড়া, জলপাই, চালতা, গাজর, রসুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, বেগুন, সাতকড়া ইত্যাদি থেকে আচার তৈরি করা হয়।

২.১.২.২ চাটনী:

সাধারণত ফলের পাল্পের সাথে লবণ ও চিনি মিশিয়ে চাটনী তৈরী করা হয়। বিভিন্ন মশলা মিশিয়ে চাটনী স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়ানো যায়। দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করার জন্য চাটনীতে সোডিয়াম বেনজোয়েট (০.৬%) মেশানো হয়। চাটনী ভাত, রুটি, লুচি ইত্যাদি তন্দুল জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে অল্প পরিমাণ চাটনী মিশিয়ে খেতে ভাল লাগে। চাটনী অন্যান্য খাদ্যকে বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তোলে। বরই, তেঁতুল, জলপাই, আম, আমড়া ও আচার ইত্যাদি থেকে চাটনী তৈরি করা হয়।

২.১.২.৩ কেচাপ বা সস্:

ফল ও সবজির ঘন রস বা পাল্পের সঙ্গে বেশী মাত্রায় চিনি, ভিনেগার ও মশলা মিশিয়ে যে খাদ্য প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয় তাকে সস্ বা কেচাপ বলে। কেচাপ তৈরির সময় ফল বা সবজির পাল্প ব্যবহার করা হয়। কেচাপ বা সস্ে অ্যাসেটিক এসিড বা ভিনেগার মিশ্রিত থাকায় এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে। এছাড়াও প্রিজারভেটিভ হিসেবে কেচাপ বা সস্ে সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহার করা হয়। এ ধরণের খাদ্য বেশ মুখরোচক। রুটি, পাউরুটি, ঘি বা তেলে ভাজা খাদ্যদ্রবের সঙ্গে অল্প পরিমাণ সস্ বা কেচাপ মিশিয়ে খেতে বেশ ভাল লাগে। সাধারণত পাকা টমেটো, পাকা তেঁতুল, কাঁচা আম ইত্যাদি থেকে সস্ বা কেচাপ তৈরি করা হয়।

২.১.৩ জুস বা স্কোয়াশ তৈরি করে ফলের রস সংরক্ষণ:

বিভিন্ন প্রকার ফলের রস নিষ্কাশন করে স্কোয়াশ, নেকটার বা জুস হিসেবে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

২.১.৩.১ স্কোয়াশ:

ফলের রসের সাথে চিনি, পানি, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ সংযোজন করে স্কোয়াশ তৈরি করা যায়। স্কোয়াশে চিনির পরিমাণ বেশি থাকে বিধায় খাওয়ার পূর্বে পানি মিশিয়ে নিতে হয়।

২.১.৩.২ নেক্টার/ জুস:

ফলের রসের সাথে চিনি, পানি, সাইট্রিক এসিড ও প্রিজারভেটিভ মিশিয়ে নেক্টার/জুস তৈরি করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়। খাওয়ার সময় নেক্টার বা জুসে পানি মেশানো প্রয়োজন পড়ে না।

২.১.৪ স্টীপিং পদ্ধতি বা লবণের দ্রবণে সবুজ ফল সংরক্ষণ:

কোন সংরক্ষক দ্রবণে ফল-সবজি ডুবিয়ে রেখে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ বলা হয়। গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড, পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (কে এম এস) ও লবণ নির্দিষ্ট অনুপাতে পানিতে মিশিয়ে সংরক্ষক দ্রবণ তৈরি করা হয়। কাঁচা আম, জলপাই, আমড়া, আমলকি ইত্যাদি টক জাতীয় ফল স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ৯-১২ মাস পর্যন্ত স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষিত ফলসমূহ পরবর্তীতে আচার, চাটনি তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। স্বল্প ব্যয় সম্পন্ন এ পদ্ধতিতে ফল সংরক্ষণের মাধ্যমে মূল্যবান ফলের অপচয় রোধ করা যায়।

চিত্র: স্টীপিং পদ্ধতি বা লবনের দ্রবনে ফল সংরক্ষণ

২.১.৪.১ স্টীপিং-এর উদ্দেশ্য

- ⇨ স্টীপিং পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ফল সমূহের আচার ও চাট্নি তৈরীতে ব্যবহার।
- ⇨ পঁচনশীল কৃষিজ পণ্যসমূহের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো।
- ⇨ সংরক্ষিত ফল সমূহ আচার ও চাট্নি উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরীতে সরবরাহের মাধ্যমে পারিবারিক আয় বৃদ্ধিকরণ।

২.১.৪.২ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

- ⇨ বায়ুরোধ নিশ্চিতকারী ঢাকনাসহ প্লাস্টিক ড্রাম/কনটেইনার।
- ⇨ আঠাযুক্ত টেপ।
- ⇨ গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড।
- ⇨ পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট (কে এম এস)
- ⇨ লবণ।

২.১.৪.৩ সংরক্ষণের পদ্ধতি

- ⇨ পরিপুষ্ট কাঁচা ফল সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।
- ⇨ ফলের আকার অনুযায়ী দুই বা চার টুকরো করে কেটে বা পুরোটাই এ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন: অপুষ্ট বীজযুক্ত আমের ক্ষেত্রে, আকার অনুযায়ী দুই বা চার টুকরা করে কেটে নিতে হবে এবং বীজ ও বীজের খোসা ফেলে দিতে হবে। পুষ্ট বীজযুক্ত আমের ক্ষেত্রে আমগুলি লম্বালম্বিভাবে তিন টুকরো করতে হবে।
- ⇨ স্টীপিং দ্রবণ তৈরীর জন্যে ৮% লবণ, ১.২৫% গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড এবং ০.১% পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ব্যবহার করুণ (১ কেজি দ্রবণ তৈরির জন্যে ৮০ গ্রাম লবণ, ১২.৫ গ্রাম গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড এবং ১ গ্রাম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ৯০৬.৫ গ্রাম পরিষ্কার পানিতে মিশ্রিত করা হয়)।
- ⇨ প্লাষ্টিকড্রাম/কনটেইনারটি ভালভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে গরম (৮০-৯০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রার) পানিতে খলিয়ে (Rinse করে) জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- ⇨ ফল/ফলের টুকরো পরিষ্কার এবং জীবাণুমুক্ত ড্রাম বা কনটেইনারে রেখে স্টীপিং দ্রবণ যোগ করুন (প্রতি কেজি ফল/ফলের টুকরার জন্যে আনুমানিক ১.২৫ থেকে ১.৫ কেজি স্টীপিং দ্রবণ প্রয়োজন)।
- ⇨ দ্রবণ ও ফল ভর্তি পাত্রের মুখে ঢাকনা লাগিয়ে দিয়ে সংযোগস্থলের উপর দিয়ে আঠাযুক্ত টেপ ভালভাবে লাগিয়ে দিন যাতে পাত্রটি সম্পূর্ণরুপে বায়ুরোধী হয়।
- ⇨ পাত্রগুলো অপেক্ষাকৃত ঠান্ডাস্থানে রেখে দিতে হবে।
- ⇨ ব্যবহারের পূর্বে স্টীপিং দ্রবণে সংরক্ষিত ফল/ফলের টুকরোগুলি পরিমিতভাবে পানিতে ধুতে হবে এবং চুলার জ্বাল কমানো-বাড়ানোর মাধ্যমে ৮০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রা বজায় রেখে গরম পানিতে ৩ মিনিট ধরে হালকাভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে।

শতকরা ১০ ভাগ লবণের দ্রবণে ০.০৩% অ্যাসিটিক এসিড ও ০.০৫% কেএমএস মিশিয়ে কাঁচা আম, আমড়া ও জলপাই ৬-৮ মাস ভাল অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায় এবং পরে আচার ও চাটনী তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

২.১.৪.৪ ফল ও সবজি শুকিয়ে সংরক্ষণ

চিত্র: ফল শুকিয়ে সংরক্ষণ

২.১.৪.৫ সৌর ড্রায়ার ও খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি: বাংলাদেশে বিভিন্ন মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ফলমূল ও শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। ফলমূল ও শাক-সবজি দ্রুত পঁচনশীল কৃষিজাত দ্রব্য। প্রতি বছর এদেশে উৎপাদিত ফলমূল ও শাক-সবজির প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিভিন্ন কারণে পঁচে নষ্ট হয়। সংরক্ষণের মাধ্যমে এ অপচয়ের আংশিক রোধ করা সম্ভব। সংরক্ষণ একটি সহজ পদ্ধতি। সৌর তাপে শুকানো বলতে সৌর ড্রায়ারের মাধ্যমে শুকানোকে বুঝায়। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতিতে রোদে খোলা অবস্থায়

কাঁচা আম, কুল, আমসত্ব, মরিচ, করলা, লালশাক, পাটশাক ইত্যাদি শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। খোলা রোদে শুকানো পদ্ধতিটি ত্রুটিপূর্ণ এবং শুকানো খাদ্যদ্রব্য নিম্নলিখিত উপায়ে দূষিত হতে পারে:

- ⇨ খাদ্যদ্রব্য সহজেই কীটপতঙ্গ ও জীবাণু দ্বারা দূষিত হয়।
- ⇨ বায়ুবাহিত ধুলাবালি খাদ্যদ্রব্য দূষিত করে।
- ⇨ পশুপাখির সংস্পর্শে আসার কারনে খাদ্যদ্রব্য সহজেই দূষিত হয়।
- ⇨ ঢেকে না রাখলে হঠাৎ বৃষ্টি এলে খাদ্যদ্রব্য ভিজে যায়।
- ⇨ উন্নতমানের শুকনো খাদ্যদ্রব্য তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পাওয়া যায় না।
- ⇨ ফলে খোলা অবস্থায় রোদে শুকানো দূষিত খাদ্য খেয়ে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হয়।

উপরোল্লিখিত ত্রুটিগুলি দূর করে উন্নতমানের শুকনো খাদ্যদ্রব্য তৈরীর লক্ষ্যে বিশেষ করে শীতকালীন শাক-সবজি সৌর তাপে শুকিয়ে সংরক্ষণের জন্য খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট, বিসিএসআইআর এর সংশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ, গ্রামীণ জনগনের জন্য সহজ প্রযুক্তি হিসাবে সৌর ড্রায়ার ও সৌর তাপে খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। সৌর ড্রায়ারের ও খাদ্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

২.১.৪.৬ সৌর ড্রায়ারের পরিচিতি:

সৌর ড্রায়ার হচ্ছে শুকানোর এক ধরণের যন্ত্র। এটা সৌর শক্তি দ্বারা পরিচালিত। এটি দেখতে চারপায়া যুক্ত একটি বাক্সের মত, যার উপর স্বচ্ছ পলিথিনের আবরণ থাকে। সূর্যালোক থেকে বেশী পরিমাণ তাপ সংগ্রহ করে সৌর ড্রায়ারের ভিতরের বাতাসকে গরম করা হয় এবং সেই অধিক গরম বাতাস খাদ্যদ্রব্য শুকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকার ফলমূল ও শাক-সবজি প্রক্রিয়াজাত করে এর ভিতরে রেখে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়।

২.১.৪.৭ ২০০ সে.মি. ও ৮৫ সে.মি. (৬″-৫″ × ২″-৯″) মাপের বাঁশের তৈরী একটি সৌর ড্রায়ারের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা:

ক) কাঠামো:

দৈর্ঘ্য ২০০ সে.মি. (৭৮.৭৪ ইঞ্চি), প্রস্থ ৮৫ সে.মি. (৩৩.৪৬ ইঞ্চি)।

পিছনের উচ্চতা ৮১ সে.মি. (৩১.৮৯ ইঞ্চি)

সামনের উচ্চতা ৫১ সে.মি. (২০.০৮ ইঞ্চি)

প্রস্তুত প্রণালী - মাপ অনুযায়ী বাঁশ ও বাঁশের ফালি কেটে ড্রায়ারের কাঠামো তৈরী করতে হবে (চিত্রে দ্রষ্টব্য)।

চিত্র: সৌর ড্রায়ারের কাঠামো

খ) দেওয়াল:

সামনের দেওয়াল: দৈর্ঘ্য ২০০ সে.মি. (৭৮.৭৪ ইঞ্চি), প্রস্থ ৩০ সে.মি. (১১.৮১ ইঞ্চি)।

প্রস্তুত প্রণালী: মাপ অনুযায়ী ২টি বাঁশের চাটাই কেটে এর মধ্যবর্তী অংশে ৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) পুরু করে খড় রেখে বেঁধে দিতে হবে। তারপর দেওয়ালের ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) ব্যবধানে ছিদ্র করে বাঁশের নল লাগাতে হবে।

ছিদ্রগুলো ১.২৫ সে.মি. (০.৫ ইঞ্চি) ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হবে (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

চিত্র: সামনের দেয়াল

পিছনের দেওয়াল: দৈর্ঘ্য ২০০ সে.মি. (৭৮.৭৪ ইঞ্চি), প্রস্থ ৬০ সে.মি. (২৩.৬২ ইঞ্চি)।

প্রস্তুত প্রণালী: মাপ অনুযায়ী ২টি বাঁশের চাটাই কেটে এর উপরে বর্ণিত নিয়মে তৈরি করতে হবে। তারপর এর মাঝখানে নীচ হতে ১০ সে.মি. (৪ ইঞ্চি) উপরে ৬৪ সে.মি. × ৪০ সে.মি. (২৫.২০ ইঞ্চি ও ১৫.৭৪ ইঞ্চি) মাপের একটি দরজা কাটতে হবে (চিত্রে দ্রষ্টব্য)।

চিত্র: পিছনের দেয়াল

চিত্র: দরজা

পাশের দেওয়াল: দৈর্ঘ্য ৮৫ সে.মি. (৩৩.৪৬ ইঞ্চি)
পিছনের প্রস্থ ৬০ সে.মি. (২৩.৬২ ইঞ্চি)
সামনের প্রস্থ ৩০ সে.মি. (১১.৮১ ইঞ্চি)

প্রস্তুত প্রণালী: মাপ অনুযায়ী ২টি বাঁশের চাটাই কেটে একই নিয়মে তৈরি করতে হবে। (চিত্রে দ্রষ্টব্য) পাশের দেওয়াল মোট দুইটি হবে।

চিত্র: পাশের দেয়াল

ভূমিভাগের দেওয়াল: দৈর্ঘ্য ২০০ সে.মি. (৭৮.৭৪ ইঞ্চি)

প্রস্থ ৮৫ সে.মি. (৩৩.৪৬ ইঞ্চি)

প্রস্তুত প্রণালী: মাপ অনুযায়ী ২টি বাঁশের চাটাই কেটে একই নিয়মে তৈরি করতে হবে। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)

চিত্র: ভূমিভাগের দেয়াল

গ) **ট্রে:** দৈর্ঘ্য ৬০ সে.মি. (২৩.৬২ ইঞ্চি)

প্রস্থ ৬০ সে.মি.(২৩.৬২ ইঞ্চি)

প্রস্তুত প্রণালী: মাপ অনুযায়ী বাঁশের ফালি কেটে ট্রে তৈরী করতে হবে। ট্রেগুলো ছিদ্রযুক্ত হবে। (চিত্রে দ্রষ্টব্য)। মোট তিনটি ট্রে তৈরী করতে হবে।

চিত্র: ট্রে

ঘ) **স্বচ্ছ পলিথিনের ঢাকনা:** স্তর - দ্বিস্তর বিশিষ্ট। পুরুত্ব- ০.১৫ মি.মি. (০.০৫ ইঞ্চি)
পরিমাপ- দৈর্ঘ্য ২৩০ সে.মি. (৯০.৫৫ ইঞ্চি), প্রস্থ ৮০ সে.মি. (৩১.৫ ইঞ্চি)।

ড্রায়ারের বিভিন্ন অংশের সংযোজন

উপরে বর্ণিত কাঠামো ও দেওয়ালগুলি তৈরীর পর ভূমি হতে ২১ সে.মি. (৮.২৬ ইঞ্চি) উপরে ভূমিভাগের দেওয়ালটি ভূমির সমান্তরালে এবং অন্যান্য দেওয়ালগুলি খাড়াভাবে কাঠামোর সাথে তার দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

ভূমিভাগের দেওয়ালের ১০ সে.মি. (৪ইঞ্চি) উপরে বাঁশের ফালির একটা পাটাতন তৈরী করে তার উপর ট্রে ৩টি রাখতে হবে। ২টি নলী বাঁশের সাহায্যে স্বচ্ছ পলিথিনটি বাঁশের ফালির তৈরী একটি ফ্রেমের মধ্যে আটকিয়ে ও ড্রায়ারের উপরের খোলা অংশে সংযোজন করা যায়।

ড্রায়ারের ভিতরের দেওয়ালে কালো রং করণ

দেওয়ালগুলির ভিতরের অংশ কাল রং করতে হবে। কারণ কাল রং সূর্যালোক থেকে বেশী পরিমাণ তাপ শোষণ করে। ফলে ড্রায়ারের ভিতরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

⇨ একই পদ্ধতিতে কাঠের সৌর ড্রায়ার তৈরি করা যায়।

২.১.৪.৮ শুকানোর পূর্বে ফলমূল ও শাক-সবজী প্রক্রিয়াজাতকরণ

বাছাইকরণ: প্রথমেই কাঁচামালগুলি (ফলমূল ও শাক-সবজি) বাছাই করতে হবে। পোকায় আক্রান্ত, ইঁদুরে আক্রান্ত, বর্ণহীন, দূর্গন্ধযুক্ত, কাটা বা ফাটা কাঁচামাল বাদ দিতে হবে। কাঁচামালগুলি তাজা ও ভাল হতে হবে। নতুবা ভাল শুষ্ক খাদ্যসামগ্রী তৈরী করা যাবে না।

ধৌতকরণ: বাছাই করা কাঁচামালগুলি পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করতে হবে। এই ধৌতকরণের ফলে কাঁচামালের গায়ে লেগে থাকা ধূলাবালি, পোকামাকড় ইত্যাদি দূরীভূত হবে।

খোসামুক্তকরণ: খোসামুক্তকরণের সময় হাতে গ্লাভস্ লাগাতে হবে। তারপর ছুরি দিয়ে কাঁচামালগুলির খোসা মুক্ত করতে হবে। সকল শাক-সবজি খোসা মুক্তকরণের প্রয়োজন হয় না। যেমন টমেটোর শুধু বোঁটা, করলার দুই প্রান্ত, শাকের গোড়ার দিক, বাঁধাকপির গোড়ার দিক ও উপরের কিছু পাতা বাদ দিতে হবে। খোসামুক্ত কাঁচামালগুলিকে ৫% খাবার লবণের দ্রবণে ডুবিয়ে রাখতে হবে (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম লবণ মিশালে ৫% এর দ্রবণ হবে) কারণ খোলা বাতাসে রেখে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে খোসামুক্ত কাঁচামালগুলির রং কাল বা বাদামী বর্ণের হয়ে যায়।

টুকরাকরণ: খোসামুক্ত করার পর কাঁচামালগুলি ১-২ মি.মি. সাইজে টুকরো করতে হবে। টুকরো করার পর টুকরোগুলিকে পূর্বের মত আবার লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

সিদ্ধকরণ: লবণ পানি হতে টুকরো কাঁচামালগুলি উঠিয়ে ফুটন্ত পানিতে সিদ্ধ করতে হবে। সিদ্ধকাল শাক-সবজি ও ফলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন: আলু ১৫ মিনিট, করলা ২ মিনিট, টমেটো ২ মিনিট, আনারস ৫ মিনিট সময় সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। সবুজ শাক-সবজি সিদ্ধ করার সময় ০.১% খাবার সোডা ফুটন্ত পানির সঙ্গে যোগ করতে হবে (১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম খাবার সোডা মিশালে ০.১% দ্রবণ হবে)। সিদ্ধ করার ফলে শুকাতে সময় কম লাগে, বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রীর পূণর্গঠন করা (আগের অবস্থায় আনা) সহজ হয়, সবজি বা ফলের স্বাভাবিক স্বাদ ও রং পরিবর্তনকারী এনজাইম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

সালফাইটিং করণ: সিদ্ধ করা কাঁচামালগুলি সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইটের ০.৫% দ্রবণে ১ ঘন্টাকাল ডুবিয়ে রেখে সালফাইটিং করা হয় (১ লিটার পানিতে এক চা চামচ বা ৫ গ্রাম) সোডিয়াম

মেটা বাই সালফাইট মিশালে ০.৫% এর দ্রবণ হবে)। সালফাইটিং করণের ফলে খাদ্যসামগ্রী বিশুদ্ধ হওয়ার সময় বা গুদামজাতকরণের সময় কালো বা বাদামী বর্ণের হয় না।

২.১.৪.৯ সৌর ড্রায়ারে ফলমূল ও শাক-সবজি বিশুদ্ধীকরণ

ট্রেতে খাদ্য সজ্জিতকরণ: সালফাইটিংকৃত টুকরো কাঁচামালগুলি প্রতি ট্রেতে ১.৫-১.৭ কেজি হারে এক স্তরে সাজাতে হবে, যেন একটির উপর আরেকটির টুকরো না পড়ে।

সৌর ড্রায়ারে বিশুদ্ধীকরণ: খাদ্য দিয়ে সজ্জিত ট্রে-গুলি ড্রায়ারের পিছনের দরজা দিয়ে ড্রায়ারের ভিতরে রাখতে হবে এবং ড্রায়ারটিকে সূর্যের দিকে মুখ করে দিতে হবে। প্রতিদিন ২ বার করে খাদ্য দ্রব্য গুলিকে উল্টিয়ে দিতে হবে। এইভাবে ২ থেকে ৪ দিনে খাদ্যদ্রব্যগুলি নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় শুকিয়ে যাবে। যখন বিশুদ্ধ খাদ্যসামগ্রী মচমচে ও খটখটে হবে, তখন বুঝতে হবে বিশুদ্ধীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। বিশুদ্ধ শাক-সবজি জলীয় অংশ ৫-৮% ও বিশুদ্ধ ফলের জলীয় অংশ ১০-১২% রাখতে হবে।

২.১.৪.১০ সৌর ড্রায়ারে ফলমূল ও শাক-সবজী শুকানোর ফ্লো-চার্ট:

সৌর ড্রয়ারে ফলমূল ও শাকসব্জী শুকানোর ফ্লো-চার্ট

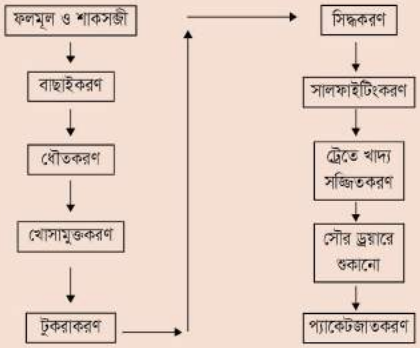

প্যাকেট জাতকরণ: সৌর ড্রায়ারে শুকানো খাদ্য সামগ্রী একটি বড় টিনের বা প্লাস্টিকের পাত্রের ভিতরে একটি বড় পলিথিন প্যাকেট রেখে তার মধ্যে রাখতে হবে। তারপর বড় পলিথিন প্যাকেটের মুখে বেঁধে ও পাত্রের মুখ ঢাকনা দ্বারা ঢেকে রাখলে শুকনো খাদ্যসামগ্রী দীর্ঘদিন সংরক্ষিত থাকে। যেমন: শুকানো আলু ১ বছর, শুকনো গাজর ৬ মাস, শুকনো করলা ৬ মাস, শুকনো আনারস ৬ মাস, শুকনো টমেটো ৩-৪ মাস কাল সংরক্ষিত থাকে।

২.১.৪.১১ সৌর ড্রায়ারের ও খাদ্যসংরক্ষণ প্রযুক্তির বিশেষত্ব:

- ⇨ সৌর ড্রায়ারে বিভিন্ন ফলমূল ও শাক-সবজি শুকাতে কোন জ্বালানি খরচ লাগে না।
- ⇨ শুকনো ফলমূল ও শাক-সবজি জীবাণুমুক্ত থাকে।
- ⇨ শাক-সবজি ও ফলমূলের অপচয় অনেকাংশ রোধ করা যায়।
- ⇨ শুকনো সংরক্ষিত শাক-সবজি ও ফলমূলের সাধারণ গুণাগুণ ও রং অক্ষুন্ন থাকে।
- ⇨ সৌর তাপে সংরক্ষণ প্রযুক্তি অন্যান্য সংরক্ষণ প্রযুক্তির চেয়ে সহজ ও সস্তা।
- ⇨ সৌর তাপে সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে কোন ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।
- ⇨ সৌর তাপে সংরক্ষণ প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি যেমন খাবার লবণ, খাবার সোডা ও সোডিয়াম মেটা বাইসালফাইট (বিপি গ্রেড) দামে সস্তা।

২.১.৪.১২ উন্নততর প্রযুক্তির ড্রায়ার

ক্যাবিনেট সোলার ড্রায়ার:

সূর্যরশ্মিকে উন্নত পদ্ধতিতে ফল-মূল ও শাক-সবজি শুকানোর জন্য ক্যাবিনেট সোলার ড্রায়ার উদ্ভাবন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বৈশিষ্ট্যসমূহ –

- ⇨ স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত লৌহ দ্বারা স্থানীয় সাধারণ ওয়ার্কশপে তৈরি করা যায়।
- ⇨ এই যন্ত্রে কোনো ঘূর্ণায়মান অংশ নেই ফলে এর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ খরচ নেই বললেই চলে।
- ⇨ এ ড্রায়ার টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, আলুর চিপস, আমসত্ব, মরিচ শুকানোর জন্য খুবই উপযোগী।
- ⇨ প্রতিবার ৪ থেকে ৮ কেজি সবজি শুকানো যায় এবং শুকাতে ২ থেকে ৪ দিন লাগে। ২ থেকে ৩ দিনে ১.২ কেজি আমসত্ব তৈরি করা যায়।
- ⇨ যন্ত্রটির মূল্য ২,৫০০ টাকা।

চিত্র: ক্যাবিনেট সোলার ড্রায়ার

২.১.৪.১৩ শুকনো খাদ্যদ্রব্যের পূনর্গঠন ও রান্নার নিয়ম:

শুকনো ফল যেমন: আনারস, আম, কলা সরাসরি খাওয়া যায়। শুকনো সবজিগুলি রান্নার পূর্বে ঠান্ডা পানিতে ১-২ ঘন্টা বা ফুটন্ত পানিতে ফুটন্ত অবস্থায় ১৫-২০ মিনিট সময় রাখলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে অর্থাৎ পূনর্গঠিত হয়। তারপর ইচ্ছামত রান্না করা যায়।

২.১.৫ শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতক (Zero Energy Evaporative Cooler):

পানি বাষ্পে পরিণত হবার সময় চারপাশের পরিবেশ থেকে তাপ শোষণ করে ফলে ঐ পরিবেশটি ঠান্ডা হয় এবং পরিবেশের আর্দ্রতাও বেড়ে যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে বাষ্পীভবনজাত শীতক তার মধ্যে রক্ষিত পণ্যের আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়। এই শীতকের তাপমাত্রা বায়ুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রার কাছাকাছি বজায় থাকে এবং তাপমাত্রার উঠানামা খুব কম হয়। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে বায়ুর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন আর্দ্রতা যখন যথাক্রমে ৩৯.১ ডিগ্রী সে., ২৪.২ ডিগ্রী সে. এবং ৩৬% ও ৯% তখন শীতকের ক্ষেত্রে হবে যথাক্রমে ২৫.২ডিগ্রী সে. ২৩ ডিগ্রী সে. এবং ৯৭% ও ৯৪%। সস্তা ও দেশজ দ্রব্যাদি দিয়ে খুব সহজেই এধরনের শীতক তৈরি করা সম্ভব। এই শীতক ব্যবহার করে পণ্যাদির জীবনকাল বেশ কয়েকদিন বাড়ানো যেতে পারে।

২.১.৫.১ উদ্দেশ্য

- ফল, সবজি ও এদের থেকে উৎপাদিত খাদ্য পণ্য এবং অন্যান্য পণ্যের স্বল্পকালীন সংরক্ষণের জন্যে একটি শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতক (Zero energy evaporative cooler)-এর গ্রামীণ পর্যায়ে প্রচলন।
- শুন্যশক্তি ব্যবহারকারী বাষ্পীভবনজাত শীতক এর মধ্যে রাখার মাধ্যমে ফল, সবজি ও এদের থেকে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য, অন্যান্য পণ্যাদির আয়ুষ্কাল বাড়ানো।
- পণ্যের তরতাজাভাব এবং আদি স্বাদ গুণাগুণ বজায় রাখা।
- পঁচনশীল কৃষিজ পণ্যের সংগ্রহোত্তর অপচয় কমানো।

নিচে দুই ধরনের শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতকের গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হল:

২.১.৫.২ ইট ও বালির তৈরি শীতক

- এই শীতক তৈরি করতে পোড়া ইট ও বালির প্রয়োজন। এর প্রকোষ্ঠের মেঝেটি একস্তর ইট বিছিয়ে তৈরি করতে হবে এবং পার্শ্বের দেয়ালটি এমনভাবে দুই স্তর ইট দিয়ে তৈরী করতে হবে যাতে স্তর দুইটির মাঝখানে ৩ ইঞ্চি ফাঁকা থাকে যেখানে বালির স্তর রাখা যায় (চিত্র)
- ইট ও বালি পানি দিয়ে সম্পৃক্ত করে ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রকোষ্ঠের উপরে ভেজা চটের বেড়া দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।
- শীতক নির্মাণের পর সম্পৃক্ত করে ভেজানোর পর পণ্যাদি সংরক্ষণ করা হয়। দৈনিক সকালে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে পারলেই তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

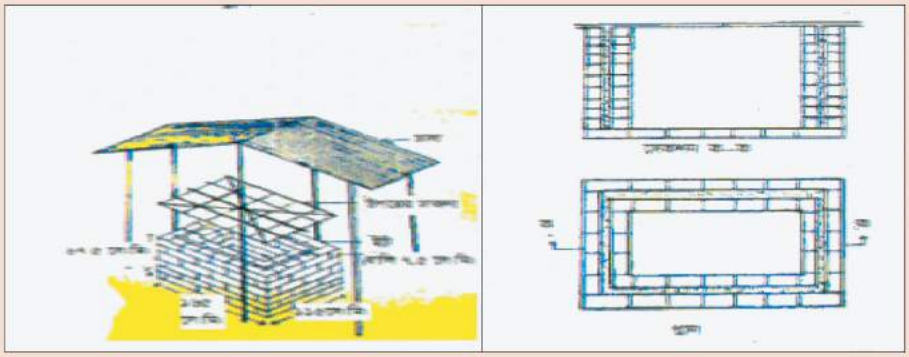

চিত্র: শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবনজাত শীতকের আইসোমেট্রিক দৃশ্য

- ভেজা চটের বেড়ার দুর্গন্ধ এড়ানোর জন্যে প্রতিদিন একবার করে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। তবে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে দুইটা চটের বেড়া তৈরি করতে পারলেই ভাল হয়, যাতে একটি ব্যবহার করে অন্যটি ধুয়ে পরিষ্কার করে রোদে ভাল করে শুকিয়ে দুর্গন্ধ তাড়ানো যায়।
- পণ্যাদি পরিষ্কার করে শীতকের মধ্যে রাখা হয়। বেশী পরিমাণে পণ্যাদি রাখার ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রার বায়ু চলাচলক্ষম খাচার মধ্যে রেখে একটি খাচার উপরে আরেকটি রাখা যেতে পারে, যাতে করে নিচের পণ্য থেত্লিয়ে না যায়।

চিত্র: শক্তি ব্যবহারবিহীন বাষ্পীভবন শীতক

২.১.৫.৩ মাটির পাত্র, বালি ও বাঁশের তৈরী শীতক :

- ⇨ এই শীতক তৈরিতে খরচ আরও কম পড়ে। এক্ষেত্রে ইটের তৈরি প্রকোষ্ঠের পরিবর্তে একটি বড় আকারের মাটির পাত্রই প্রকোষ্ঠ হিসাবে কাজ করে। (চিত্র)।
- ⇨ মাটির পাত্রটি একটি গোলাকার বাঁশের খাচার ভিতর এমনভাবে বসানো থাকে যাতে পাত্রের বহির্গাত্র ও খাচার ভিতর গাত্রের মধ্যস্থলে বালির স্তর রাখা যায়।
- ⇨ পাত্রের মুখটি ভেজা চটের বেড়া দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এটির কার্যপ্রণালীও ইটের তৈরি শীতকের মতই। এই শীতক ঘরের কোণে বায়ু চলাচলযুক্ত জায়গায় রেখে দেয়া যায়। পারিবারিক কাজে ব্যবহার করার জন্য এটি বেশ উপযোগী।

চিত্র: মাটির পাত্র, বালি ও বাঁশের খাচার তৈরি শীতক

২.১.৫.৪ খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রন

খাদ্যের গুনগতমান বলতে খাদ্যের যৌগিক বৈশিষ্ট্য বোঝায় যা ভিন্ন ভিন্ন একককে পার্থক্য করে এবং ভোক্তা কর্তৃক খাদ্যের গ্রহনযোগ্যতার মাত্রা নির্ণয় করে।

মান নিয়ন্ত্রন: যেসব ক্ষেত্রে মাননিয়ন্ত্রন অত্যন্ত প্রয়োজন তা হলো–

- ⇨ কাঁচামাল
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকরন সামগ্রী ।

- ⇨ প্যাকেজিং সামগ্রী ।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকরন পদ্ধতি
- ⇨ চূড়ান্ত খাদ্য দ্রব্যের জন্য গুদামঘর
- ⇨ পরিবহন।

২.১.৫.৫ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ করার আগের কাজ :

বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলির মধ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলি সম্পাদনের সময় অনেক বেশি সতর্কতা প্রয়োজন। কারন খাদ্য সরাসরি মানুষের দেহের ভেতরে প্রবেশ করে। মূল কাজ শুরুর আগে যেসব বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

- ⇨ উৎপাদন কক্ষে যাতে মশা মাছি প্রবেশ করতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ⇨ যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হবে তা কমপক্ষে আগের দিনেই পরিস্কার ও জীবানুমুক্ত করে রাখতে হবে।
- ⇨ বোতলের ক্যাপ আগে থেকেই পরিস্কার করে শুষ্ক করে রাখতে হবে।
- ⇨ সিরাপ ছাঁকার কাপড় অবশ্যই পরিস্কার করে শুষ্ক করে রাখতে হবে।
- ⇨ সিরাপ ছাঁকার কাপড় অবশ্যই পরিস্কার থাকবে।
- ⇨ পরিস্কার কাপড় পরিধান করতে হবে এবং মাথার চুল কাপড় বা টুপি দিয়ে ঢাকা থাকবে।
- ⇨ কর্মরত সবার হাত ও পায়ের নখ ছোট থাকবে এবং হাত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- ⇨ চুলায় ও যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজ করার সময় সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে।
- ⇨ টয়লেট ব্যবহারের পর হাত পা সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

২.১.৫.৬ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যাবলী শেষ হলে করণীয় কাজ :

- ⇨ সমস্ত কক্ষ ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।
- ⇨ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রগুলোর সকল অংশ পরিস্কার পানি দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে রাখতে হবে।
- ⇨ ব্যবহৃত জিনিসপত্র গুলো সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।
- ⇨ প্রক্রিয়াজাতকৃত চূড়ান্ত খাদ্যসামগ্রী ঢেকে রাখতে হবে।

২.১.৫.৭ খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে পানির ভুমিকা :

আমরা জানি পানির অপর নাম জীবন কিন্তু আবার সেই পানি মরণের কারনও হতে পারে। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরনে পানির ভূমিকা অসীম। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরনে অবশ্যই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করতে হবে।

- ⇨ অবশ্যই টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করতে হবে।
- ⇨ যদি টিউবয়েলের পানি না পাওয়া যায় তাহলে পানি ফুটিয়ে ছেঁকে ঠান্ডা করে নিতে হবে।
- ⇨ পানি সংরক্ষণের পাত্র অবশ্যই পরিস্কার হবে এবং পাত্রে মুখ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

২.১.৫.৮ চিনির সিরায় ফল সংরক্ষণ

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
ফলের টুকরা(পাকা আম/কাঁঠাল/ আনারস)	৮০০ গ্রাম	৬০.০০
চিনি	৫৩৮ গ্রাম	২৭.০০
সাইট্রিক এসিড	৮ গ্রাম	১.৬০
পানি	১ লিটার	১০.০০
কেএমএস	৫০০ মিলিগ্রাম	১০.০০
	মোট =	১০৮.৬০

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, বটি অথবা ছুরি, সসপেন, কাঁচের জার, ষ্টীলের ডিস্ ইত্যাদি।

২.১.৫.৯ সংরক্ষণের পদ্ধতি

- ফলগুলো পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ২ সে. মি. x ২ সে. মি. x ২ সে. মি. আকারে টুকরো করুন।
- পরিমাণমত চিনি নিয়ে ৩৫ ডিগ্রী ব্রিক্স দ্রবণ তৈরি করুন (৫৩৮ গ্রাম চিনির সাথে ১ কেজি পানি মিশালে ৩৫ ডিগ্রী ব্রিক্স চিনির দ্রবণ তৈরি হবে।
- পাতলা কাপড় দিয়ে চিনির দ্রবণ ছেঁকে ১০ মিনিট ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করুন।
- এবার পরিমাণমত সাইট্রিক এসিড ও কেএমএস চিনির দ্রবণে যোগ করুন।
- ফলের টুকরোগুলোকে জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে চিনির দ্রবণ যোগ করুন যাতে ফলের উপরে চিনির দ্রবণের আবরণ থাকে।
- হালকা করে ছিঁপি এঁটে বোতলগুলো ফুটন্ত পানিতে রেখে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করুন।
- বোতলগুলো ফুটন্ত পানি থেকে সরিয়ে উত্তপ্ত অবস্থায় ছিঁপি এঁটে দিন এবং উল্টো করে রাখুন।
- ঠান্ডা হয়ে আসলে ছিঁপি ও বোতলের সংযোগস্থলে মোম গলিয়ে সম্পূর্ণ বায়ুরোধী করুন।
- বোতলগুলো শুস্ক ও ঠান্ডা জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.২ চিনি ও এসিড সংযোজন করে সংরক্ষণ

২.২.১ পেয়ারার জেলী

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
পেয়ারার রস	১ কেজি	২০.০০
চিনি	৬৫০ গ্রাম	৩২.০০
সাইট্রিক এসিড	০৭ গ্রাম	১.৪০
পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইট (কেএমএস)	০.২ গ্রাম	০.১০
	মোট=	৫৩.৫০

পেয়ারার জেলী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি :

হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সস্‌পেন বা কড়াই, বটি অথবা ছুরি, বোতল, চামচ, পাতলা কাপড় ইত্যাদি।

প্রস্তুতি প্রণালি:

রস নিস্কাশন

- ⇨ পরিপুষ্ট অথবা কাঁচা পেয়ারা পরিস্কার পানিতে ধুয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে অর্ধেক পরিমাণ পানিতে সিদ্ধ করুন।
- ⇨ সিদ্ধ করার সময় কাঠের হাতল দিয়ে টুকরোগুলোকে ভালভাবে নাড়াচাড়া দিন যাতে এগুলোতে আঠালো ভাব সৃষ্টি হয়। পেয়ারা সাধারণত ৩০-৫০ মিনিট সিদ্ধ করলেই নিঃসৃত রস জেলী তৈরির উপযোগী হয়।
- ⇨ পাতলা কাপড় দিয়ে ছেঁকে রস আলাদা করে নিন। এ রসের সাথেই বের হয়ে আসে পেকটিন এসিড নিঃসৃত পেকটিন ও এসিড জেলী তৈরিতে সাহায্য করে। রস যতই স্বচ্ছ হবে জেলী ততই উজ্জ্বল হবে। এভাবে জেলী তৈরির জন্য রস তৈরি হয়ে গেল।

জেলী তৈরিকরণ :

- ⇨ উপকরণ পরিমাণ অনুযায়ী রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড আলাদা করে ওজন নিন।
- ⇨ এবার রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। রান্না চলাকালীন সময়ে অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে। মিশ্রণটি মোটামুটি গাঢ় হয়ে আসলে রিফ্রাক্টোমিটার দিয়ে ঘন ঘন গাঢ়ত্ব পরীক্ষা করুন এবং মিশ্রণটি ৫৮ ডিগ্রী ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন অতঃপর সাইট্রিক এসিড যোগ করুন এবং মিশ্রণটি ৬৫ ডিগ্রী ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ রিফ্রাক্টোমিটার এর অনুপস্থিতিতে শীটিং পরীক্ষার মাধ্যমে জেলী হয়ে যাওয়ার চুড়ান্ত অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব। শীটিং পদ্ধতিতে চামচ মিশ্রণের মধ্যে ডুবানো হয় এবং ঠান্ডা করে চামচ বেয়ে মিশ্রণটিকে পড়তে দেয়া হয়। যদি এটা এক ধারে না পড়ে শীটের আকারে পড়তে থাকে তাহলে বুঝতে হবে জেলী হয়ে গেছে।

⇨ টিএসএস ৬৫ ডিগ্রী ব্রিক্স হলে বা শিটিং পরীক্ষায় জেলী প্রস্তুত হওয়ার কাছাকাছি বোঝা গেলে নির্ধারিত পরিমাণ কেএমএস সামান্য পানিতে গুলিয়ে মিশ্রণের সাথে যোগ করুন এবং সামান্য একটু জ্বাল দিয়ে অর্থাৎ ব্রিক্স হলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করুন।

⇨ এবার জেলী জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ভালভাবে ছিঁপি এঁটে দিয়ে শুকনো ও ঠান্ডা জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

বোতল জীবাণুমুক্তকরণ

⇨ জেলীর বোতলগুলোকে সসপেনে পানি নিয়ে তাতে ১৫-২০ মিনিট ফুটালে জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়। বোতলগুলোকে গরম পানিতে রাখাই উত্তম। জেলী তৈরি হয়ে গেলে বোতলগুলো পাত্র থেকে উঠিয়ে পানি নিংড়িয়ে জেলী ভরা উত্তম।

২.২.২ কাঁঠালের জ্যাম

উপকরণসমূহ

কাঁঠালের পাল্প	১ কেজি।
চিনি	১ কেজি
সাইট্রিক এসিড	২.৫০ গ্রাম
আনারসের এসেন্স	৫০০ গ্রাম
কমলার এসেন্স	০.৫০ মিলি লিটার

প্রস্তুত প্রণালী

⇨ পাকা কাঁঠালকে কয়েক টুকরা করে কোসগুলোকে হাত দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে।

বিচি গুলো আলাদা করে কোষগুলোকে সসপেনে নিয়ে ১৫ মিনিট জ্বালাতে হবে।

⇨ ব্লেন্ডারে নিয়ে পাল্প তৈরি করতে হবে।

⇨ কাঁঠালের পাল্পকে ১:১ অনুপাতে অন্য পাল্পের সঙ্গে মেশাতে হবে।

⇨ পাল্প মিশ্রণের সঙ্গে ১ কেজি চিনি মেশাতে হবে।

⇨ পাল্প এবং চিনির মিশ্রণকে স্টিলের সসপেনে নিয়ে জ্বালাতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত চিনির পরিমাণ ৬৮%-৭০% এ পৌছায়।

⇨ সূর্যালোকে ২ দিন শুকাতে হবে তাতে জলীয় অংশের পরিমাণ ৯%-১২% এ নেমে আসে।

২.২.৩ আনারসের জেলী

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমাণ	দাম (টাকা)
রস	১কেজি	২৫.০০
চিনি	৮২০ গ্রাম	৪২.০০
সাইট্রিক এসিড	০৭ গ্রাম	১.৪০
পেকটিন	১৮ গ্রাম	২৭.০০
(KMS)	০.২৭ গ্রাম	০.১০
	মোট =	৯৫.৫০

আনারসের জেলী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সস্‌পেন বা কড়াই, বটি অথবা ছুরি, বোতল, চামচ, পাতলা কাপড় ইত্যাদি।

তৈরির পদ্ধতি

রস নিস্কাশন

- ⇨ পাকা আনারস সংগ্রহ করে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিন।
- ⇨ চাকু বা বটি দিয়ে উপরের ত্বক ফেলে দিন এবং ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে আনারসের চোখ ফেলে দিন।
- ⇨ অতঃপর আনারস লম্বালম্বি কেটে বেশ কয়েকটা ফালি করুন এবং ভিতরের শক্ত অংশ ফেলে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন।
- ⇨ টুকরোগুলো হাত দিয়ে ভালভাবে চেপে রস বের করুন এবং সাদা পাতলা কাপড় দিয়ে রসগুলো ছেঁকে নিন যাতে কোন আঁশ না থাকে। এভাবে আনারসের জেলী তৈরির জন্য রস তৈরি হয়ে গেল।

জেলী তৈরি করণ:

- ⇨ উপকরণ পরিমান অনুযায়ী রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড, পেকটিন ও কেএমএস আলাদা আলাদা করে ওজন করে নিন। ওজন করা পেকটিনের সমপরিমাণ চিনি আলাদা করে রেখে দিন।
- ⇨ অতঃপর রসের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। রান্না চলাকালীন সময় চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। মিশ্রনটি মোটামুটি গাঢ় হয়ে আসলে রিফ্রাক্টোমিটার যন্ত্র দিয়ে গাঢ়ত্ব ঘন ঘন পরীক্ষা করুন এবং মিশ্রনটি ৫৫ ডিগ্রী ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ এবার আলাদা করে রাখা চিনি ও পেকটিন শুকনো অবস্থায় মিশিয়ে রসের সাথে যোগ করুন এবং চামচ দিয়ে ভালভাবে নাড়তে থাকুন।
- ⇨ ৫৮ ডিগ্রী ব্রিক্স আসলে সাইট্রিক এসিড যোগ করে ভালভাবে নাড়তে থাকুন এবং মিশ্রনটি ৬৫ ডিগ্রী বিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ অতঃপর নির্ধারিত পরিমাণ কেএমএস ২ চা-চামচ পানিতে মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিন।
- ⇨ এবার চুলা থেকে পাত্রটি নামিয়ে তৈরীকৃত জেলী জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ভালভাবে ছিঁপি এঁটে দিয়ে পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.২.৪ আনারসের জ্যাম

উপকরণ সমূহ

উপকরণ	পরিমাণ	দাম (টাকা)
পাল্প	১ কেজি	২৫.০০
চিনি	৭০০ গ্রাম	৩৫.০০
সাইট্রিক এসিড	০৮ গ্রাম	১.৬০
পেকটিন	১৮ গ্রাম	২৭.০০
পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইট (কেএমএস)	০.২৫ গ্রাম	০.১০
	মোট =	৮৮.৭০

আনারসের জ্যাম

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সসপেন বা কড়াই, বটি অথবা ছুরি, বোতল, চামচ, পাতলা কাপড়, ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রনালী:

রস নিস্কাশন :

- ⇨ পাকা আনারস পরিস্কার পানিতে ধুয়ে ছুড়ি দিয়ে কেটে উপরের ত্বক ফেলে দিন।
- ⇨ ছুড়ির অগ্রভাগ দিয়ে আনারসের চোখ ভালভাবে তুলে ফেলুন। এবার আনারস লম্বালম্বি কেটে বেশ কয়েকটা ফালি করুন এবং ভিতরের শক্তকোর ফেলে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন।
- ⇨ টুকরোগুলো ব্লেন্ডার মেশিনে ব্লেন্ড করে পাল্প তৈরি করে নিন। এভাবে জ্যাম তৈরির জন্য পাল্প তৈরি হয়ে গেল।

জ্যাম তৈরি করণ:

- ⇨ উপকরণের পরিমান অনুযায়ী পাল্প, চিনি, সাইট্রিক এসিড ও পেকটিন আলাদা আলাদা করে ওজন করে নিন।
- ⇨ ওজন করা পেকটিনের সমপরিমাণ চিনি আলাদা করে রেখে দিন।
- ⇨ পাল্পের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিন। রান্না চলাকালীন সময় চামচ দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন।
- ⇨ মিশ্রনটি মোটামুটি গাঢ় হয়ে আসলে রিফ্রাক্টোমিটার যন্ত্র দিয়ে গাঢ়ত্ব ঘন ঘন পরীক্ষা করুন এবং মিশ্রনটি ৫৫ ডিগ্রী ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ অতঃপর আলাদা রাখা চিনি ও পেকটিন শুকনো অবস্থায় মিশিয়ে পাল্পের সাথে যোগ করুন এবং চামচ দিয়ে ভালভাবে নাড়তে থাকুন।
- ⇨ মিশ্রনটি ৫৮ ডিগ্রী ব্রিক্স আসলে সাইট্রিক এসিড যোগ করে ভালভাবে নাড়তে থাকুন এবং মিশ্রনটি ৬৫ ডিগ্রী ব্রিক্স আসা পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ অতঃপর নির্ধারিত পরিমাণ কেএমএস ২ চা-চামচ পানিতে মিশ্রণের মাধ্যে দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিন।
- ⇨ এবার চুলা থেকে মিশ্রণের পাত্রটি নামিয়ে তৈরিকৃত জ্যাম জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ভালভাবে ছিঁপি এঁটে দিন।
- ⇨ জ্যামের বোতলগুলো পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩ আচার, চাটনী এবং সস্ তৈরী করে সংরক্ষণ

২.৩.১ আমের আচার:

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
কাঁচি আম	১ কেজি	৩০.০০
রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	২.০০
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	২.০০
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম	১.০০
জিরার গুঁড়া	২.৫০ গ্রাম	১.০০
চিনি	১০০ গ্রাম	৫.০০
লবণ	৪০ গ্রাম	১.৫০
সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.	৬৪.০০
অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মি.লি.	৩.০০
	মোট =	১২০.৫০

আমের আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, সসপেন বা কড়াই, ঝাঝরা, বটি অথবা ছুরি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ ত্রুটিমুক্ত কাঁচি আম পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন।
- ⇨ আম খোসা সহ লম্বা করে ৪ টুকরো করুন এবং বীচি ফেলে টুকরোগুলো ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ টুকরোগুলো থেকে পানি ঝরিয়ে নিন।
- ⇨ এখন আদা ও রসুন ১০০ সিসি ১% অ্যাসেটিক এসিড মিশিয়ে ব্লেন্ডার মেশিনে ব্লেন্ড করে তাতে মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
- ⇨ একটি কড়াইয়ে সবটুকু তেল নিয়ে তাতে আমের টুকরোগুলো ভালভাবে ভেজে ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন।

⇨ সসপেনে পরিত্যক্ত তেলে আদা, রসুন ও হলুদ মরিচের গুড়ার পেস্ট ভালভাবে কষিয়ে নিন।

⇨ অতঃপর স্বল্প ভাজা আমের টুকরা, চিনি, লবণ, সরিষার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, মেথির গুঁড়া ইত্যাদি এক এক করে সসপেনে ঢালুন এবং সামান্য জ্বাল দিন।

⇨ বাকী অ্যাসেটিক এসিড দিন এবং জ্বাল দিতে থাকুন।

⇨ ঘন হয়ে এলে জ্বাল বন্ধ করুন এবং গরম অবস্থায় বোতলে ভরে বোতলের মুখ বন্ধ করে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বোতলে পিক্‌লের উপরে তেলের আবরণ থাকে।

⇨ আচারের বোতলগুলো শুকনো এবং পরিস্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.২ কাঁঠালের আচার

উপকরণ সমূহ

- খোসা ছাড়ানো কাঁঠাল ১ কেজি।
- লবন ৫০ গ্রাম (ব্রাইন দ্রবণ প্রস্তুতের জন্য) ।
- হলুদের গুড়া ২.৫ গ্রাম।
- ধনিয়া গুড়া ২৫ গ্রাম।
- শুকনা মরিচের গুড়া ১৫ গ্রাম।
- লবন ১০ গ্রাম।
- চিনি ১৫০ গ্রাম।
- সিরকা ১০ মিলি।

প্রস্তুত প্রনালী

০১। ছোট আকারের অপুষ্ট/সবুজ রংয়ের কাঁঠালের খোসা ছাড়িয়ে নিতে হবে।

০২। খোসা ছড়ানো কাঁঠালকে ১২-১৮ মিলি মিটার পাতলা টুকরো করতে হবে।

০৩। ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম লবন যোগ করে ব্রাইন দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে।

০৪। কাঁঠালের টুকরো গুলোকে ব্রাইন দ্রবণে ২৪ ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে।

০৫। কাঁঠালের টুকরো গুলোকে স্টিলের চালনি দ্বারা উঠিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।

০৬। সমস্ত মসলা ও চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে।

০৭। সসপেনে মসলা ও সিরকার সাথে কাঁঠালের টুকরোগুলো মিশিয়ে ৩০ মিনিট জ্বালাতে হবে।

০৮। জীবানুমুক্ত বোতলে আচার বোতলজাত করে সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৩.৩ কাঁঠালের লেদার

উপকরণসমূহ ঃ

- কাঁঠালের কোষ ১ কেজি।
- চিনি ১০০-১৫০ গ্রাম।
- পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট ০.১ গ্রাম।

প্রস্তুত প্রণালী

০১। পাকা কাঁঠালকে কেটে কয়েক টুকরা করতে হবে।

০২। কাঁঠালের কোষগুলোকে আলাদা করতে হবে।

০৩। চিনির সঙ্গে কোষগুলোকে মেশাতে হবে।

০৪। পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট কে পানিতে দ্রবীভূত করে চিনিসহ কোষের সঙ্গে মেশাতে হবে।

০৫। স্টিম জ্যাকেটেড প্যানে মিশ্রণকে গাঢ় করতে হবে।

০৬। গাঢ় মিশ্রণকে স্টিলের ট্রেতে ৩ মিমি পুরু করে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

০৭। সূর্য্যালোকে ২ দিন শুকোতে হবে যাতে জলীয় অংশের পরিমাণ ৯%-১২% এ নেমে আসে।

২.৩.৪ আমড়ার আচার:

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
আমড়া	১ কেজি	২০.০০
রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	২.০০
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	২.০০
জিরার গুঁড়া	২.৫০ গ্রাম	১.০০
মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০
চিনি	১০০ গ্রাম	৫.০০
লবণ	৫০ গ্রাম	১.৫০
সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.	৬৪.০০
অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মি. লি.	৩.০০
	মোট =	১১০.৫০

আমড়ার আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, বটি, ছুরি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ভাল আমড়া বেছে নিন। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বটি বা চাকু দিয়ে আমড়ার উপরের ছাল বা ত্বক ছিলে ফেলুন।
- আমড়াগুলো ৩-৪ সে.মি. লম্বা টুকরো করে কেটে নিন।
- কাটা আমড়াগুলো সামান্য পানি দিয়ে সিদ্ধ করুন এবং পরে পানি নিংড়িয়ে নিন।
- অন্যান্য উপকরণগুলো পরিমাণমত ওজন নিন।
- আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মি. লি. ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেষ্ট তৈরি করে তার সাথে শুকনো মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
- একটি কড়াইয়ে সবটুকু সরিষার তেল নিয়ে তাতে আমড়ার টুকরোগুলো ভালভাবে ভেজে নিন।
- একটি ঝাঝরা চামচ দিয়ে আমড়ার ভাজা টুকরোগুলো আলাদা পাত্রে রাখুন।
- এবার আদা, রসুন ও হলুদ-মরিচের পেষ্ট আমড়া ভেজে নেয়ার পর কড়াই এর পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে ভালভাবে কষিয়ে নিন।
- অতঃপর কষানো মশলার সাথে ভাজা আমড়ার টুকরো, চিনি, লবণ, মেথির গুঁড়া, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করুন।
- অবশেষে অবশিষ্ট ১৪ মি.লি. অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে সামান্য সময় জ্বাল দিন।
- অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর গরম অবস্থায় জীবানুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিঁপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আচারের উপরে তেলের প্রলেপ থাকে।
- আচারের বোতলগুলো পরিস্কার এবং শুকনো জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.৫ জলপাই এর আচার:

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
জলপাই	১ কেজি	২০.০০
রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	২.০০
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	২.০০
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম	১.০০
জিরার গুঁড়া	২.৫০ গ্রাম	১.০০
চিনি	১০০ গ্রাম	৫.০০
লবণ	৪০ গ্রাম	১.৫০
সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.	৬৪.০০
অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মি.লি.	৩.০০
	মোট =	১১০.৫০

জলপাই এর আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, সসপেন বা কড়াই, ঝাঝরা, বটি অথবা ছুরি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ জলপাই আচারের জন্য ভাল জলপাই বেছে নিন। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বটি বা চাকু দিয়ে জলপাইগুলো দু'পাশ থেকে সাইস করে কেটে নিন।
- ⇨ অন্যান্য উপকরণগুলো পরিমাণমত ওজন নিন।
- ⇨ কাটা জলপাইগুলো সামান্য পানিতে সিদ্ধ করুন এবং পরে পানি নিংড়িয়ে নিন।
- ⇨ আদা ও রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলিমিটার ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেষ্ট তৈরি করুন এবং তাতে মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
- ⇨ একটি কড়াইয়ে ওজন করা তেল নিয়ে তাতে জলপাইয়ের টুকরোগুলো ভালভাবে ভেজে নিন।
- ⇨ একটি ঝাঝরা চামচ দিয়ে জলপাইয়ের টুকরোগুলো উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন।
- ⇨ এবার আদা, রসুন ও হলুদ-মরিচের পেষ্ট জলপাইয়ের টুকরোগুলো ভেজে নেয়ার পর কড়াই এর পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে ভালভাবে কষিয়ে নিন।
- ⇨ অতঃপর কষানো মশলার সাথে ভাজা জলপাইয়ের টুকরো, চিনি, লবণ, মেথির গুঁড়া, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করুন।
- ⇨ অবশেষে অবশিষ্ট ১৪ মি.লি. গাসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড ভালভাবে মিশিয়ে সামান্য সময় জ্বাল দিন।
- ⇨ অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর তৈরিকৃত আচার গরম গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ছিঁপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আচারের উপরে তেলের প্রলেপ থাকে।
- ⇨ আচারের বোতলগুলো শুকনো এবং পরিস্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তৈরিকৃত আচার সংরক্ষণ করুন।

২.৩.৬ চালতার আচার :

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)	
চালতার টুকরো	১ কেজি	৩০.০০	
রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০	
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০	
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০	
হলুদের গুড়া	১০ গ্রাম	২.০০	
সরিষার গুঁড়া (ভাজা)	২০ গ্রাম	২.০০	
মেথির গুঁড়া	০৫ গ্রাম	১.০০	
জিরার গুঁড়া	২.৫০ গ্রাম	১.০০	
লবণ	৫০ গ্রাম	১.৫০	
চিনি	১০০ গ্রাম	৫.০০	
সরিষার তেল	৫০০ মি. লি.	৮০.০০	
অ্যাসেটিক এসিড	১০ মি.লি.	২.০০	
	মোট=	১৩৫.৫০	চালতার আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : সসপেন বা কড়াই, বটি অথবা ছুরি, ঝাঝরা, ঝাঝরা চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ পুষ্ট পরিপক্ক চালতা বেছে নিন। পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে বটি বা চাকু দিয়ে চালতার উপরের ত্বক বা ছাল পতলা করে ছাচিয়ে নিন।
- ⇨ অতঃপর পরিস্কার করা চালতা ৪-৫ সে.মি. লম্বা এবং ১-১.৫ সে.মি. প্রস্থ করে কেটে ফেলুন।
- ⇨ টুকরোগুলো একটি পাত্রে নিয়ে সমপরিমান পানিতে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করে নিন।
- ⇨ সিদ্ধ করা টুকরোগুলো বাঁশের চালুনী বা ঝাঝরা বোলে নিয়ে পানি ঝেরে ফেলুন।
- ⇨ আদা ও রসুন খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মি.লি. ১% অ্যাসেটিক এসিড সহযোগে পেষ্ট তৈরি করে তাতে হলুদ-মরিচের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
- ⇨ একটি কড়াইতে সবটুকু তেল নিয়ে তাতে চালতার টুকরোগুলো ভালভাবে ভেজে নিন এবং পরে তেল থেকে উঠিয়ে টুকরোগুলো একটি পাত্রে রাখুন।
- ⇨ অতঃপর আদা, রসুন ও হলুদ-মরিচের পেষ্ট চালতার টুকরোগুলো ভেজে নেয়ার পর পরিত্যক্ত তেলের মধ্যে ভেজে ভালভাবে কষিয়ে নিন।
- ⇨ এবার কষানো মসলার সাথে ভাজা চালতার টুকরোগুলো যোগ করুন এবং নাড়তে থাকুন। অতঃপর চিনি, লবণ, মেথির গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করুন।
- ⇨ অবশিষ্ট ৯ মি.লি. অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে ভালভাবে মিশিয়ে ৩-৪ মিনিট জ্বাল দিন।
- ⇨ অতঃপর চুলা থেকে নামানোর পর আচার গরম অবস্থায় জীবানুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ভালভাবে ছিপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আচারের উপরে তেলের প্রলেপ থাকে।
- ⇨ আচারের বোতলগুলো পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুণ।

২.৩.৭ বেগুনের টকমিষ্টি আচার :

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
বেগুন	১ কেজি	২০.০০
রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০
শুকনা মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	২.০০
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	২.০০
কাঁচা মরিচ	৩০ গ্রাম	২.০০
মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০
জিরার গুঁড়া	২.৫০ গ্রাম	১.০০
লবণ	৪০ গ্রাম	১.৫০
চিনি	২০০ গ্রাম	১০.০০
সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.	৬৪.০০
সিরকা	১০০ সি. সি.	৪.০০
অ্যাসেটিক এসিড	১৫ মি. লি.	৩.০০
	মোট =	১২১.৫০

বেগুনের টকমিষ্টি আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, বটি, ছুরি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ আচার এর জন্য সরু ও লম্বা বেগুন নির্বাচন করুন। বেগুনের বোঁটা ফেলে দিয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিন।
- ⇨ বেগুনগুলো ৫ সে. মি. লম্বা টুকরো করুন এবং পরে টুকরোগুলো লম্বালম্বিভাবে মাঝ বরাবর কেটে দুই ফালি করে নিন।
- ⇨ ১ কেজি পরিমান কাটা বেগুন ওজন নিয়ে নিন।
- ⇨ উপকরণের পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য দ্রব্যের ওজন নিন।
- ⇨ আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মি. লি. ১% অ্যাসেটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেষ্ট তৈরি করে তার সাথে মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।
- ⇨ কাঁচা মরিচের বোঁটা ছাড়িয়ে সিরকায় ভিজিয়ে রাখুন।
- ⇨ একটি কড়াইয়ে সবটুকু সরিষার তেল নিয়ে তাতে বেগুনের টুকরোগুলো ভালভাবে ভেজে নিন।
- ⇨ এবার টুকরোগুলো ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন।
- ⇨ আদা রসুন ও হলুদ মরিচের পেষ্ট কড়াইয়ের পরিত্যাক্ত তেলে ভালভাবে কষিয়ে নিন।
- ⇨ কষানো মশলায় ভাজা বেগুনের টুকরো, কাঁচা মরিচ, চিনি, মেথির গুঁড়া, জিরার গুঁড়া ও সরিষার গুঁড়া একে একে যোগ করুন।

⇨ অবশেষে লবণ এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থাৎ ১৪ মি. লি. গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করুন।

⇨ মিশ্রনটি একটি পুরু ঘনত্বে এলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করে দিন এবং জীবানুমুক্ত প্রশস্ত বোতলে ভরে ছিঁপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বোতলে আচারের উপরে তেলের স্তর থাকে।

⇨ আচার ভর্তি বোতল শুকনো ও পরিস্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.৮ মিশ্র সবজির আচার

উপকরণ সমূহ		
ফুলকপি	১ কেজি	
গাজর	১ কেজি	
মটর শুটি	১ কেজি	
সীম	১ কেজি	
রসুন	২৫০ গ্রাম	
আদা	৫০০ গ্রাম	
শুকনো মরিচের গুড়া	৮০ গ্রাম	
হলুদের গুড়া	৪০ গ্রাম	
সরিষার গুড়া	৮০ গ্রাম	
কাচা মরিচ	১০০ গ্রাম	
মেথীর গুড়া	২০ গ্রাম	
জিরার গুড়া	১০ গ্রাম	
লবণ	২০০ গ্রাম	
চিনি	৮০০ গ্রাম	
সরিষার তেল	১.২ লি.	
সিরকা	৪০০ গ্রাম	
অ্যাসিটিক এসিড	৬০ মিলি.	মিশ্র সবজির আচার

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :

ব্যালেন্স,সসপেন, ঝাঝরা, বটি, ছুরি, বোতল,চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী:

* সবজিগুলোকে ভালভাবে ধুয়ে টুকরো করে নিন।
* উপকরণের পরিমাণ অনুসারে অন্যান্য দ্রব্যের ওজন নিন।
* আদা এবং রসুনের খোসা ছাড়িয়ে ১০০ মিলি. ১% অ্যাসিটিক এসিড দ্রবণ সহযোগে পেষ্ট তৈরি করে তার সাথে মরিচের গুড়া ও হলুদের গুড়া ভালোভাবে মিশিয়ে নিন।
* কাঁচা মরিচের বোটা ছাড়িয়ে সিরকায় ভিজিয়ে রাখুন।
* একটি কড়াইয়ে সবটুকু সরিষার তেল নিয়ে তাতে সবজির টুকরা গুলো ভালোভাবে ভেজে নিন।
* এবার টুকরা সবজিগুলো ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন।
* আদা, রসুন ও হলুদ মরিচের পেষ্ট কড়াইয়ের অবশিষ্ট তেলে ভালোভাবে কষিয়ে নিন।

* কষানো মশলায় ভাজা সবজির টুকরো, কাচা মরিচ, চিনি, মেথীর গুড়া, ঝিরার গুড়া ও সরিষার গুড়া একে একে যোগ করুন।
* অবশেষে লবন এবং অবশিষ্ট অ্যাসেটিক এসিড অর্থ্যাৎ ১৪ মিলি, গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক এসিড যোগ করুন। মিশ্রণটি একটি নির্দিষ্ট ঘনত্বে আসলে জ্বাল দেয়া বন্ধ করে দিন এবং জীবানুমুক্ত বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বোতলে আচারের উপরে তেল থাকে।

* আচার ভর্তি বোতল শুকনো ও পরিষ্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুণ।

২.৩.৯ রসুনের আচার:

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)	
রসুনের খোসামুক্ত কোষ	১ কেজি	৬০.০০	
বাটা রসুন	৩০ গ্রাম	২.০০	
আদা	৬০ গ্রাম	৫.০০	
শুকনো মরিচের গুঁড়া	২০ গ্রাম	৪.০০	
হলুদের গুঁড়া	১০ গ্রাম	২.০০	
সরিষার গুঁড়া	২০ গ্রাম	২.০০	
জিরার গুঁড়া	২.৫ গ্রাম	১.০০	
মেঁথির গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০	
চিনি	১০০ গ্রাম	৫.০০	
লবণ	৪০ গ্রাম	১.৫০	
সরিষার তেল	৪০০ মি. লি.	৬৪.০০	
অ্যাসেটিক এসিড (গ্লেসিয়াল)	১৫ মি. লি.	৩.০০	
	মোট =	৮৬.৫০	রসুনের আচার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, ছুরি, বটি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী:

⇨ ত্রুটিবিহীন বড় আকারের রসুন নিন। কোষ আলাদা করে খোসা ছাড়িয়ে পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিন।

⇨ অন্যান্য উপকরণগুলো পরিমাণগত ওজন নিয়ে আলাদা করে রাখুন।

⇨ এবার আদা ও রসুন ১০০ সিসি ১% অ্যাসেটিক এসিডসহ বেঁটে বা ব্লেন্ডিং মেশিনে পেষ্ট তৈরি করুন এবং তাতে হলুদ ও মরিচের গুঁড়া ভালভাবে মিশিয়ে নিন।

⇨ একটি কড়াইয়ে সবটুকু তেল নিয়ে তাতে রসুনের কোষগুলো সামান্য ভেঁজে ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে আলাদা পাত্রে রাখুন।

⇨ অতঃপর সস্‌পেনের পরিত্যক্ত তেলে আদা, রসুন, হলুদ ও মরিচের পেষ্ট ভালভাবে কষিয়ে স্বল্পভাজা রসুনের কোষগুলো ঢেলে দিন এবং আস্তে আস্তে জ্বাল দিতে থাকুন।

⇨ এবার চিনি, লবণ, সরিষার গুঁড়া, মেঁথির গুঁড়া একের পর এক সস্‌পেনে ঢালুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।

⇨ শেষে বাকি ১৪ মি. লি. অ্যাসেটিক এসিড যোগ করুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।
⇨ ঘন হয়ে এলে জ্বাল বন্ধ করুন এবং পাত্রটি নামিয়ে তৈরিকৃত আচার গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ছিপি এঁটে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আচারের উপরে তেলের প্রলেপ থাকে।
⇨ আচারের বোতলগুলো শুকনো ও পরিস্কার জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.১০ জলপাই এর মিষ্টি চাটনি:

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
জলপাইর পাল্প	১ কেজি	২০.০০
চিনি	৮০০ গ্রাম	৪০.০০
লবণ	২৫ গ্রাম	১.০০
বিট লবণ	৫ গ্রাম	০.৫০
সরিষার গুড়া	১০ গ্রাম	১.০.
শুকনো মরিচের গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০
জিরার গুঁড়া	২ গ্রাম	১.০০
এলাচের গুঁড়া	৫০০ মিলি গ্রাম	১.০০
দারুচিনি গুঁড়া	৫০০ মিলি গ্রাম	০.৫০
লং এর গুঁড়া	৫০০ মিলি গ্রাম	১.০০
গোল মরিচের গুঁড়া	১ গ্রাম	১.০০
মৌরীর গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০
জৈয়ত্রী	৫০০ মিলি গ্রাম	১.৭৫
সরিষার তেল	১০০ মি. লি.	১৬.০০
কেএমএস/সোডিয়াম বেনজোয়েট	৫০০ মিলি গ্রাম	১০.০০
অ্যাসেটিক এসিড	৫ মি.লি	১.০০
	মোট	৯৭.৮০

জলপাই এর মিষ্টি চাটনি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, ছুরি, বটি, বোতল, চামচ, ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী:

⇨ কাঁচা অথচ পরিপক্ক জলপাই পরিস্কার পানিতে ধুয়ে সামান্য পানি মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।
⇨ সবগুলো উপকরণ পরিমাণগত ওজন নিয়ে আলাদা করে রাখুন।
⇨ জলপাইগুলো নরম হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে বীচি থেকে পাল্প ছাড়িয়ে নিন।
⇨ অর্ধেক বীচি ফেলে পাল্পের সাথে চিনি মিশিয়ে জ্বাল দিতে থাকুন।
⇨ মিশ্রণটি ফুটতে শুরু করলে লবণ ছিটিয়ে দিন।
⇨ কড়াইয়ের মিশ্রণটি আস্তে আস্তে নাড়তে থাকুন মিশ্রণটি ঘন হয়ে আসলে ভাজা গুঁড়া মশলা যোগ করুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে দিন।
⇨ অন্য একটি কড়াইয়ে পরিমাণমত সরিষার তেল ভালভাবে ফুটিয়ে জলপাইর চাটনীর সাথে যোগ করুন।

⇨ অতঃপর অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে জ্বাল দিতে থাকুন।

⇨ কাঙ্খিত ঘনত্বে এলে (৬২ডিগ্রি ব্রিক্স) কেএমএস/সোডিয়াম বেনজোয়েট যোগ করুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে দিন।

⇨ অতঃপর চুলা থেকে নামিয়ে জলপাইয়ের চাটনী জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভরে ভালভাবে ছিঁপি এঁটে দিন।

⇨ চাটনীর বোতলগুলো পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.১১ বরই-তেতুঁল এর টকমিষ্টি চাটনি:

উপকরণ সমূহ:

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
পাকা শুকনো বরই	১ কেজি	৩৫.০০
তেতুঁল	২৫০ গ্রাম	৩০.০০
চিনি	১.২৫ কেজি	৬২.০০
লবণ	৩৮ গ্রাম	১.২০
কালজিরা	৮ গ্রাম	০.৮০
মেথির গুঁড়া	৫ গ্রাম	১.০০
শুকনো মরিচের গুঁড়া	৬ গ্রাম	১.২৫
জিরার গুঁড়া	২.৫ গ্রাম	১.০০
লবঙ্গের গুঁড়া	৫০০ মিলি গ্রাম	১.০০
এলাচের গুঁড়া	৫০০ মিলি গ্রাম	০.৮০
দারুচিনি গুঁড়া	১ গ্রাম	০.২৫
গোল মরিচের গুঁড়া	১ গ্রাম	১.০০
জৈয়ত্রী	৫০০ মিলি গ্রাম	১.৭৫
সরিষার তেল	১০০ মি. লি.	১৬.০০
সরিষার গুঁড়া	১২ গ্রাম	১.২০
অ্যাসেটিক এসিড	৬ মি.লি	১.২০
সোডিয়াম বেনজোয়েট	৭৫ মিলি গ্রাম	৭.৫০
	মোট =	১৬৩.০০

বরই-তেতুঁল এর টকমিষ্টি চাটনি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, ছুরি, বটি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

কেচাপ তৈরির ধাপসমূহ:

⇨ ত্রুটিবিহীন বরই পরিস্কার পানিতে ধুয়ে নিন এবং বোটা ছাড়িয়ে পরিমাণমত পানিতে সারারাত ডুবিয়ে রাখুন।

⇨ পরদিন পানিতে ধুয়ে অল্প পরিমাণ পানি মিশিয়ে বরইগুলো সিদ্ধ করুন।

- ⇨ নরম হয়ে আসলে চুলা থেকে নামিয়ে কাঠের হাতল/হাত দিয়ে চেপে পাল্প বের করুন। অর্ধেক পরিমাণ বীচি পাল্পের সাথে রেখে দিন।
- ⇨ পরিমাণমত তেতুঁল ভালভাবে ধুয়ে সামান্য পানি মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন।
- ⇨ এবার বাশের চালনীতে তেতুঁল নিয়ে হাত দিয়ে ঘষে পাল্প বের করুন।
- ⇨ অতঃপর বরই ও তেতুঁলের পাল্প মিশিয়ে তার সাথে চিনি যোগ করুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে থাকুন।
- ⇨ মিশ্রণটি ফুটতে শুরু করলে প্রথমে লবণ এবং পরে অন্যান্য মশলা এক এক করে যোগ করুন।
- ⇨ অন্য একটি কড়াইয়ে পরিমাণমত সরিষার তেল ভালভাবে ফুটিয়ে বরই-তেতুঁলের মিশ্রণের সাথে যোগ করুন।
- ⇨ মিশ্রণটি ঘন হলে তাতে নির্ধারিত পরিমাণ অ্যাসেটিক এসিড যোগ করে নাড়তে থাকুন।
- ⇨ মিশ্রণটি কাঙ্খিত ঘনত্বে এলে (৬২ ডিগ্রী ব্রিক্স) সামান্য পানিতে সোডিয়াম বেনজোয়েট গুলিয়ে মিশ্রণের সাথে যোগ করুন এবং ভালভাবে মিশিয়ে চুলা থেকে নামিয়ে ফেলুন।
- ⇨ জীবানুমুক্ত বোতলে চাটনী ভরে ভালভাবে ছিঁপি লাগিয়ে পরিস্কার ও শুকনো জায়গায় স্বভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৩.১২ টমেটো কেচাপ:

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
টমেটো	১ কেজি	১০.০০
গোলমরিচ	০.২০ গ্রাম	০.২০
চিনি	৬০০ গ্রাম	৩০.০০
এলাচ	০.২০ গ্রাম	০.৩২
লবণ	১০ গ্রাম	০.৩৩
জিরা	০.২০ গ্রাম	০.০৮
পেঁয়াজ	১৫ গ্রাম	০.৭৫
জৈয়ত্রী	০.৫০ গ্রাম	১.৭৫
রসুন	০৩ গ্রাম	০.১৮
শুকনা মরিচের গুঁড়া	০.২২ গ্রাম	০.৪৪
লবঙ্গ	০.৫ গ্রাম	১.০০
সাইট্রিক এসিড	৫.০০ মি.লি	১.০০
দারুচিনি	০.৫ গ্রাম	০.১২৫
সোডিয়াম বেনজোয়েট	০.৪০ গ্রাম	০.১০
	মোট =	৪৬.৩০

টমেটো কেচাপ

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সসপেন, বটি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

কেচাপ তৈরির ধাপসমূহ:

- ⇨ মধ্যম, পাকা ও ত্রুটিমুক্ত চমেটো কেচাপ তৈরির জন্য বাছাই করে নিন।
- ⇨ টমেটোগুলো পরিস্কার পানিতে ধুয়ে কেটে টুকরো করুন।
- ⇨ টুকরোগুলো একটি সসপেনে নিয়ে কাঠের হাতা দিয়ে পিষে টমেটো পাল্প বের করুন। অতঃপর টুকরোগুলো বেরিয়ে আসা রসের মধ্যে রেখে ১৫-২০ মিনিট সিদ্ধ করুন। ত্বক ও বীচি যাতে আলাদা হতে পারে এজন্য কাঠের হাতা দিয়ে ভালভাবে নাড়ুন। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালনী দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে খোসা ও বীচি পাল্প থেকে আলাদা করুন। এই পাল্প কেচাপ তৈরিতে ব্যবহার করতে হবে।
- ⇨ পাল্প এবং উল্লেখিত পরিমাণ উপকরণ মেপে নিন।
- ⇨ পেঁয়াজ ও রসুন কুচি করে কেটে নিন। মরিচ, জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি ইত্যাদি গুঁড়া করে নিন।
- ⇨ টমেটো পাল্প ও এক-তৃতীয়াংশ চিনি এবং অন্যান্য মশলা আলাদা একটি পুটলিতে বেঁধে একত্রে একটা কড়াই এর মধ্যে নিয়ে জ্বাল দিন।

মশলার পুটলী তৈরির পদ্ধতি:

- ⇨ কুঁচি করে কাটা পেঁয়াজ, খোসা ছাড়ানো এবং টুকরোকৃত রসুন, মরিচের গুঁড়া আলাদাভাবে রাখা হয়।
- ⇨ দারুচিনি, গোলমরিচ, এলাচ, জিরা, জৈত্রী গুঁড়া করা হয়।
- ⇨ উপরোক্ত সকল মশলা একত্রে একটি কাপড়ের টুকরায় নিয়ে থলির আকারে বেঁধে নেয়া হয়।
- ⇨ জ্বাল দেয়া টমেটো পাল্পের পরিমান এক-তৃতীয়াংশ হলে মশলার থলেটি ভালভাবে চেপে রস বের করে সরিয়ে ফেলুন। অবশিষ্ট চিনি এবং লবণ যোগ করুন।
- ⇨ ২৪ ডিগ্রী ব্রিক্স পর্যন্ত রান্না করার পর অ্যাসেটিক এসিড যোগ করুন এবং সোডিয়াম বেনজোয়েট সামান্য পানিতে দ্রবীভূত করে যোগ করে ২৫ ডিগ্রী বিক্স পর্যন্ত রান্না করুন।
- ⇨ তৈরিকৃত কেচাপ জীবাণুমুক্ত বোতলে ভরে ছিঁপি এঁটে দিয়ে ৫ মিনিট উল্টিয়ে রাখুন।
- ⇨ বোতলের গাত্র পরিস্কার করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন।

২.৪ জুস বা স্কোয়াশ তৈরি করে ফলের রস সংরক্ষণ

২.৪.১ আনারসের স্কোয়াশ :

উপকরণসমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
রস	১ কেজি	৬০.০০
চিনি	১.৪৩ কেজি	৭১.০০
সাইট্রিক এসিড	৪৭ গ্রাম	৯.৪০
কেএমএস	২ গ্রাম	০.৪০
পানি	১.৫২ লিটার	১৫.০০
	মোট =	১৫৫.৮০

আনারসের স্কোয়াশ

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, বোতল, বটি, ছুরি, পাতলা কাপড়, থার্মোমিটার ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

রস নিস্কাশন :

পাকা আনারস পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে উপরের ত্বক ফেলে দিন।

⇨ ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে আনারসের চোখ তুলে ফেলুন।

⇨ অতঃপর লম্বালম্বি কেটে কয়েকটা ফালি করুন এবং ভিতরের শক্ত কোর ফেলে দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটুন। টুকরোগুলো হাতের মুঠিতে চাপ দিয়ে রস বের করুন এবং পাতলা কাপড়ে ছেকে আঁশ পৃথক করুন।

স্কোয়াশ তৈরির ধাপসমূহ:

⇨ নিস্কাশিত রস ৭৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ৩ মিনিট ফুটিয়ে পাস্তুরাইজ করে নিন।

⇨ রস, চিনি, সাইট্রিক এসিড, কেএমএস আলাদা ভাবে ওজন করে নিন। পানি উপকরণ অনুসারে মেপে নিন।

⇨ চিনি ও এসিড পানিতে মিশিয়ে সিরাপ তৈরি করুন (কেএমএস দ্রবীভূত করার জন্য মেপে নেয়া পানি থেকে অল্প পরিমাণ পানি আগেই আলাদা করে ফুটিয়ে রাখতে হয়)।

⇨ মিশ্রণটি উত্তপ্ত করুন এবং কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিন।

⇨ নির্ধারিত পরিমাণ কেএমএস সামান্য গরম পানিতে গুলিয়ে স্কোয়াশের সাথে যোগ করুন।

⇨ তৈরিকৃত স্কোয়াশ জীবাণুমুক্ত বোতলে ভর্তি করে ছিপি এঁটে দিন। বোতলগুলো বায়ুরোধী করার জন্য ছিপির চারপাশে মোম গলিয়ে দেয়া যেতে পারে।

২.৪.২ আমের নেক্টার:

উপকরণসমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
আমের রস	১ কেজি	১২০.০০
চিনি	৪০০ গ্রাম	২০.০০
পানি	২.৫ লিটার	২৫.০০
সাইট্রিক এসিড	৯ গ্রাম	১.৮০
কেএমএস	৫০০ মি. গ্রা.	১০.০০
	মোট =	১৭৬.৮০

আমের নেক্টার

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : হ্যান্ড রিফ্রাক্টোমিটার, ব্যালেন্স, সসপেন, ঝাঝরা, বটি, ছুরি, বোতল, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

ত্রুটিমুক্ত পাকা আম পরিস্কার পানিতে খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং হাত দিয়ে চেপে রস নিংড়িয়ে নিন।

- ⇨ মোটা চালনীতে রস ছেকে আমের আশ ফেলে দিন এবং একটি আলাদা পাত্রে রাখুন।
- ⇨ চিনি, পানি ও সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে সিরাপ প্রস্তুত করে ১০ মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করুন।
- ⇨ আমের রসে সিরাপ ঢালুন এবং হাতা দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে দিন। সিরাপ মিশ্রিত রস আবারও ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন।
- ⇨ অতঃপর মিশ্রণের সাথে কেএমএস মিশিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন।
- ⇨ এবার তৈরিকৃত নেক্টার গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ১ ইঞ্চি খালি রেখে ভরে ফেলুন এবং বোতলের ছিপি হালকাভাবে এঁটে দিন।
- ⇨ নেক্টারের বোতলগুলো পানিতে ২০ মিনিট ফুটিয়ে নেয়ার পর ছিপি এঁটে ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

২.৪.৩ আমের জুস :

উপকরণ সমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
আমের রস	১ কেজি	১২০.০০
চিনি	৮২০ গ্রাম	৪১.০০
সাইট্রিক এসিড	১৬ মি. লি.	৩.২০
পানি	৪.৮ লিটার	৪৮.০০
কেএমএস	৬৬০ মিলিগ্রাম	১৩.২০
	মোট =	২২৫.৪০

আমের জুস

প্রস্তুত প্রণালী :

- ক্রটিমুক্ত পাকা আম পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং হাত দিয়ে চেপে রস নিংড়িয়ে নিন।
- মোটা চালনীতে রস ছেকে আমের আশ ফেলে দিন এবং একটি আলাদা পাত্রে রাখুন।
- চিনি, পানি ও সাইট্রিক এসিড মিশিয়ে সিরাপ প্রস্তুত করে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন এবং পরে ঠান্ডা করুন।
- আমের রসে সিরাপ ঢেলে মিশিয়ে দিন। সিরাপ মিশ্রিত রস আবারও ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন।
- অতঃপর কেএমএস মিশিয়ে গরম অবস্থায় জীবানুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করুন এবং বোতলের ছিঁপি হালকা করে এঁটে দিন।
- এবার বোতলগুলো ফুটন্ত পানিতে ২০ মিনিট ফুটিয়ে নেয়ার পর ছিঁপি এঁটে ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন।

২.৫ চিপ্‌স তৈরী করে সংরক্ষণ

২.৫.১ কলার চিপ্‌স :

উপকরণসমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
কাঁচকলা /মেহের সাগর কলা দুই হালি	১ কেজি অথবা	১০.০০
লেবুর রস/সাইট্রিক এসিড	১০ গ্রাম	০২.০০
সয়াবিন তেল	২০০ মিলি লিটার	২৪.০০
	মোট =	৩৬.০০

কলার চিপ্‌স

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : ব্যালেন্স, কাঠের সাইসার, বটি অথবা ছুরি, ঝাঝরা চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ পরিপক্ক কাঁচকলা/মেহের সাগর কলা নিন।
- ⇨ বটি অথবা ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন।
- ⇨ খোসামুক্ত কলাগুলো ০.১% সাইট্রিক এসিডের দ্রবণ অথবা লেবুর রস (১টি লেঁবুর ৪ ভাগের ১ ভাগ ১ কেজি পানিতে) মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ অতঃপর স্লাইসার দিয়ে কলাগুলোকে ১.৫-১.৭৫ মি. মি. পুরু করে গোল করে অথবা লম্বালম্বিভাবে (৫-৬ সে. মি. লম্বা) কেটে নিন।
- ⇨ লম্বা স্লাইসের জন্য কলাগুলো মাঝামাঝি অংশে ২ ভাগে ভাগ করে (৫ -৬ সে. মি. লম্বা) কাটতে হবে।
- ⇨ গোল/লম্বা ফালিগুলো আবারও এসিড/লেঁবুর রস মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে দিন এবং ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ এবার গোল/লম্বা স্লাইসগুলো একটি ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে বাঁশের চালানি/অ্যালুমিনিয়ামের চালনিতে রেখে পানি ঝরিয়ে নিন।
- ⇨ পানি ঝরানো শেষ হলে গোল স্লাইস/লম্বা স্লাইস সয়াবিন তেল/পাম অয়েলে ডুবিয়ে ভালভাবে ভেজে নিন।
- ⇨ স্লাইসের গায়ে লাগানো তেল শোষনের জন্য ভাজা স্লাইসগুলো কাগজের উপর/টিসু পেপারের উপর রেখে দিন।
- ⇨ এবার স্লাইসগুলোতে পরিমাণ মত লবণ ও মশলা মিশিয়ে পরিবেশন করুন।
- ⇨ সংরক্ষণ করতে হলে পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ অথবা প্লাষ্টিকের বয়মে রেখে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণ করলে লবণ মেশানো যাবে না।
- ⇨ পলিপ্রোপাইলিনের মুখ সিলার দিয়ে অথবা মোমের আগুনে ধরে বন্ধ করে দিতে হবে যাতে ভিতরে বাতাস প্রবেশ না করে। বয়মের ঢাকনার চারদিকে স্কচ টেপ লাগিয়ে বন্ধ করতে হবে।

২.৫.২ আলুর চিপ্‌স :

উপকরণসমূহ :

উপকরণ	পরিমান	দাম (টাকা)
মাঝারী ধরণের রোগমুক্ত আলু	১ কেজি	১০.০০
লবণ	৫০ গ্রাম	১.৫০
কেএমএস	৫০০ মিলি গ্রাম	১০.০০
সয়াবিন তেল	২৫০ মিলি লিটার	৩০.০০
	মোট =	৫১.৫০

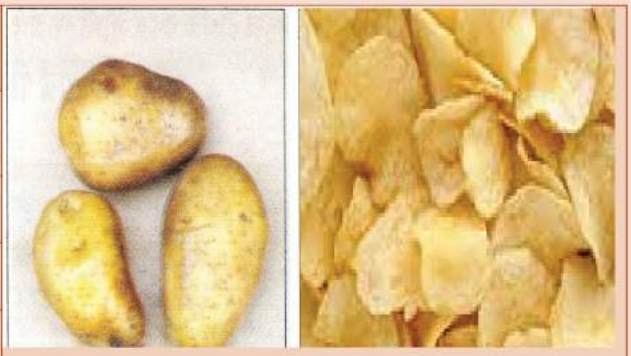

আলুর চিপ্‌স

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি : সসপেন, স্লাইসার, ঝাঝরা, ছুরি অথবা বটি, চালনী, চামচ ইত্যাদি।

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ আলুগুলো ভাল করে ধুয়ে বটি অথবা ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন এবং ২% লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ এবার আলুগুলো স্লাইসার দিয়ে ১.৫ মি.মি মাপে গোল করে কেটে আবারও লবণ পানিতে ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ স্লাইসগুলো লবণ পানি থেকে উঠিয়ে চলন্ত পানিতে ভাল করে ধুয়ে নিন এবং গরম পানিতে (৯০ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায়) ৩-৪ মিনিট ব্লাঞ্চিং করুন।
- ⇨ অতঃপর স্লাইসগুলো গরম পানি থেকে উঠিয়ে কেএমএস মিশ্রিত (০.৫ গ্রাম/ লিটার) ঠান্ডা পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন। কেএমএস এর পরিবর্তে ১ % সাইট্রিক এসিড ব্যবহার করা যায়।
- ⇨ এবার আলুর স্লাইসগুলো পানি থেকে ঝাঝরা চামচ দিয়ে উঠিয়ে এ্যালুমিনিয়াম অথবা বাঁশের চালনীতে ঢেলে দিন।
- ⇨ পনি ঝরে গেলে আলুর স্লাইসগুলো ফুটন্ত সয়াবিন তেলে/পাম অয়েলে ডুবিয়ে ভালভাবে ভেজে নিন।
- ⇨ আলুর চিপ্‌সগুলো তেলমুক্ত করার জন্য পরিষ্কার কাগজ/টিসু পেপারের উপর কিছুক্ষণ রেখে দিন।
- ⇨ এবারে মরিচের গুঁড়া, বীট লবণ ইত্যাদি মিশিয়ে পরিবেশন করুন।
- ⇨ সংরক্ষণ করতে চাইলে পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেটে অথবা প্লাষ্টিকের বয়মে ভরে ভালভাবে মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। বয়মের ঢাকনার চারিদিকে স্কচটেপ আটকিয়ে বন্ধ করা উত্তম।

আলুর চিপ্‌স শুকিয়ে রাখার পদ্ধতি :

- ⇨ কেএমএস মিশ্রিত পানি থেকে সাইসগুলো উঠিয়ে এবং পানি ঝরিয়ে মেশিনে অথবা মশারীর নেটের উপর রেখে রৌদ্রে ভালভাবে শুকাতে হবে যাতে মচমচে হয়।
- ⇨ এরপর স্লাইসগুলো ঠান্ডা করে পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ অথবা প্লাষ্টিকের বয়মে ভালভাবে মুখ বন্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৫.৩ আলুর ফ্রেন্স ফ্রাই :

প্রস্তুত প্রণালী :

- ⇨ খোসা ছাড়ানো আলুগুলো ২.৫ থেকে ৩ ইঞ্চি লম্বা করে ফ্রেন্স ফ্রাই কাটার অথবা বটি দিয়ে ১/২ ইঞ্চি ব্যাস পরিমাণ নিয়ে ফালি করুন ও ফালিগুলো ২% লবণ মিশ্রিত পনিতে রাখুন।
- ⇨ আলুর ফালিগুলো লবণ পানি থেকে উঠিয়ে ধুয়ে নিন এবং গরম পানিতে ৩-৪ মিনিট ব্লাঞ্চিং করুন।
- ⇨ এবার আলুর ফালিগুলো কেএমএস মিশ্রিত (০.৫ গ্রাম/লিটার) ঠান্ডা পানিতে ১০ মিনিট ডুবিয়ে রাখুন।
- ⇨ একটি ঝাঝরা চামচ দিয়ে ফালিগুলো উঠিয়ে পানি নিংড়িয়ে গরম সয়াবিন তেলে ভালভাবে ভেঁজে নিন।
- ⇨ তেল শোষনের জন্য ফালিগুলো কাগজ অথবা টিসু পেপারের উপরে কিছুক্ষণ রেখে দিন।
- ⇨ ফ্রেন্স ফ্রাইগুলোতে লবণ ছিটিয়ে টমেটো কেচাপ লাগিয়ে রুচিকর খাবার হিসেবে খাওয়া যায়।
- ⇨ সংরক্ষণ করতে হলে তেলমুক্ত ফ্রাইগুলো পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেট অথবা প্লাষ্টিকের বয়মে ভরে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন-২য় পর্যায়
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
৫ম তলা, মধ্য ভবন, খামারবাড়ী
ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

ফল ও সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচের বোতল/রাসায়নিক দ্রব্যাদি/প্রিজারভেটিভ ইত্যাদির প্রাপ্তিস্থান

ক্রমিক নং	দ্রব্যাদির বিবরণ	প্রাপ্তির স্থান
০১	কাঁচের বোতল(নতুন)	ক) মালিক এন্ড ব্রাদার্স, ৪/৫, হরিসচন্দ্র স্ট্রীট (ঢাকা ফরাশগঞ্জ ক্লাবের উল্টো দিকের গলি দিয়ে ১০০ গজ উত্তর দিকে গেলে ডান পাশে বোম্বাইয়া কলোনী, গেটের কলাপসিপল দরজা) একটি মালিক এন্ড ব্রাদার্স, টেলিফোন-৭১১৯৮৮০। খ) শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের নিচে পুরাতন বোতলের দোকানে (চাঁদখার পুর থেকে জেলখানা রোড়ের দিকে ১৫০ গজ গেলেই হাতের বাম পাশে পুরাতন বোতলের দোকান)।
০২	কাঁচের বোতল(পুরাতন)	ক) শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের নিচে পুরাতন বোতলের দোকানে (ঢাকার চাঁদখার পুর থেকে জেলখানা রোড়ের দিকে ১৫০ গজ গেলেই হাতের বাম পাশে পুরাতন বোতলের দোকান)।
০৩	অ্যাসেটিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, কেএমএস, সোডিয়াম বেনজোয়েট, পেকটিন ইত্যাদি।	ক) ঢাকায় টিকাটুলীতে (অভিসার সিনেমা হলের উল্টো দিকে) অবস্থিত বিভিন্ন ক্যামিক্যালসের দোকানে। খ) ঢাকার মিটফোর্ট হাসপাতালের উল্টো দিকের মার্কেট যেমন- নূর পারফিউমারি হাউস, ১৮, আরমানিয়া স্ট্রীট, আরমানিটোলা, ঢাকা।
০৪	রিফ্রাক্টোমিটার	ক) বিএমএ ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকা (প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে সায়েন্টিফিক স্টোরগুলোতে)। খ) ঢাকায় টিকাটুলীতে (অভিসার সিনেমা হলের উল্টো দিকে) বিভিন্ন সায়েন্টিফিক স্টোরগুলোতে)।

সহযোগীতার জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :

প্রকল্প পরিচালক
সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর,
৫ম তলা, মধ্য ভবন, কক্ষ নং-৫১৬
খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
ফোন নং-০২-৯১১৭৮৭২, ০২-৯১৪০৯৯৫।

চারা উৎপাদন

ফসল উৎপাদন

বাংলাদেশের ফসল পঞ্জিকা

কৃষির মৌসুম ৩টি

০ রবি মৌসুম, ১৬ অক্টোবর-১৫ মার্চ বা কার্তিক-ফাল্গুন

০ খরিফ-১ মৌসুম, ১৬ মার্চ-১৫ জুলাই বা চৈত্র-আষাঢ়

০ খরিফ-২ মৌসুম, ১৬ জুলাই-১৫ অক্টোবর বা শ্রাবণ- আশ্বিন